তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

স্থাপিত-১৯৭১

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

স্মরণিকা

২০২২

সম্পাদনায়

ডঃ সুলেখা পণ্ডিত ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা ২০২১-২০২২

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

স্থাপিত– ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ

স্মরণিকা

১৯৭১ – ২০২২

সম্পাদনায় –
ডঃ সুলেখা পন্ডিত ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মরণিকা–২০২২

প্রকাশক ঃ মহাবিদ্যালয় সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

প্রকাশকাল ঃ ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২২ শুক্রবার।

মুদ্রণে ঃ ব্লাইটপ্রিন্টার্স, ইলেকট্রিক অফিস মোড়, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

বিনিময় ঃ ১৫০.০০

স্মরণ

বিস্তৃত করোনাকালে বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের আমরা হারিয়েছি,
মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন – অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী,
ছাত্রে–ছাত্রী এমন যাদের আমরা হারিয়ে ফেলেছি,
তাঁদের স্মৃতির প্রতি জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

ঃঃ সূচীপত্রে ঃঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়	ড. সুলেখা পন্ডিত ও অধ্যাপক দিজেন্দ্র নাথ সিংহ	১
২।	INSTITUTIONAL BACKGROUND	Dr. Debashis Chatterjee Principal, Tufanganj Mahavidyalaya	২
৩।	সাধারণ সম্পাদকের বার্তা	সমীর দাস, সাধারণ সম্পাদক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ	৫
৪।	কলেজের তথ্য	-	৬
৫।	TRYST WITH OLIVES	Lieutenant Sayoni Biswas ANO, 7 Bengal NCC Girls' Battalion Tufanganj Mahavidyalaya Unit	১৮
৬।	কলেজের এন.সি.সি. নিয়ে কিছু কথা	প্রদীপ সরকার, পার্ট টাইম ক্লার্ক, এন.সি.সি., তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	২০
৭।	আমার চোখে জাতীয় সেবা প্রকল্প অতীতের পাতা থেকে	স্বপন দে, এন.এস.এস. আধিকারিক তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	২৩
৮।	তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পরিক্রমা কবিতা	ব্রজদুলাল পাল	২৪
৯।	সেই প্রাজ্ঞ মহীরূহ কথা	কমলেশ সরকার, প্রাক্তন ছাত্র	৩৩
১০।	অবসর	চরিত্র দেবনাথ, প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	৩৪
১১।	বাঁচিয়ে তোলা বিষ	অধ্যাপক তুহিন সান্যাল, বিভাগীয় প্রধান, ইংরাজী বিভাগ	৩৪
১২।	আমার দ্বাদশ	অধ্যাপক সুভাষ দাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দিনহাটা কলেজ	৩৫
১৩।	মা তুঝে সালাম	বিশ্বজিৎ তালুকদার, হেডক্লার্ক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	৩৯
১৪।	বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শনের প্রতিফলন	স্বপন কুমার আইচ, প্রাক্তন ছাত্র, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়	৪৩
১৫।	ভারী ধাতুযুক্ত শাকসব্জীর ব্যবহার - মানবস্বাস্থ্যের এক চরম বিপদ	ড. অভিষেক সাহা, অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ	৪৬
১৬।	মানবসভ্যতা, একটি বহুরূপী ...	ড. বাবলী রায়, অধ্যাপিকা, রসায়ন বিভাগ	৪৯
১৭।	রাষ্ট্রচেতনায় মা দুর্গা	ড. অঙ্কিতা মুখার্জী, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ	৫৭
১৮।	উপেক্ষিতা	ড. সুলেখা পন্ডিত, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ	৬১
১৯।	পদ্মশ্রী ধর্মনারায়ণ বর্মা	অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ	৬৭
২০।	বিজ্ঞাপন		৭১

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Vivekananda Street, Cooch Behar - 736101, West Bengal, India
Ph. : (03582) 229030, Tele-Fax : (03582) 224011
E-mail : vc@cbpbu.ac.in, debkumarmukherjee1@gmail.com
debkumart@yahoo.com, Website : www.cbpbu.ac.in

Dr. Debkumar Mukhopadhyay
Vice-Chancellor

19th December, 2022

MESSAGE

It is of immense pleasure to learn that Tufanganj Mahavidyalaya is going to publish a souvenir on the occasion of Golden Jubilee Celebration. The college has always provided quality education to the aspiring students ever since its inception.

I extend my good wishes to the students, the teachers and the staff of the college and hope that the college will get great recognition in the future years too.

(Debkumar Mukherjee)

ALIPURDUAR UNIVERSITY

P.O. Alipurduar Court: Dist. Alipurduar: (W. B.): Pin – 736122

Prof.(Dr.) Mahendra Nath Roy,
FRSC (London)
Vice Chancellor
Awardee of One Time Grant from UGC
Prof. Suresh C. Ameta Award from ICS
Bronze Medal from CRSI
and
Shiksha Ratna and Banga Bhushan from
the Government of West Bengal

Phone: 03564 255046
Mobile: 094344 96154
Fax: 034564 255046
Alipurduar – 736 122
West Bengal India
E-mails:
mahendraroy2018@nbu.ac.in
mahendraroy2002@yahoo.co.in
vcapduniversity@gmail.com

Date: 16-12-2022

MESSAGE

Exceedingly glad to learn that TUFANGANJ MAHAVIDYALAYA, Tufanganj, Cooch Behar is going to publish a "SOUVENIR" on the cheering occasion of "GOLDEN JUBILEE" of the Tufanganj Mahavidyalaya.

I anticipate that the Souvenir will certainly bestow every one of the human resources with a possibility of opening up a newer frontier and beginning a ground-breaking boundary encircled by the Students, Staff Members, Faculty Members, Doctors, Engineers, Leaders, General People and Social Workers and I urge one and all to continue functioning with enthusiasm and dedication keeping in mind with the mission and vision with a view to enhancing innovative augmentations of the country.

I am honoured to get this opportunity to show my appreciation to all associated with the Souvenir.

I hope the Souvenir a splendid accomplishment.

Mahendra Nath Roy

Professor (Dr.) Mahendra Nath Roy, FRSC (London)
Vice-Chancellor, Alipurduar University

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Vivekananda Street, Cooch Behar - 736101, West Bengal, India
Ph. : (03582) 230218, Ph. & Fax : (03582) 230833, E-mail : registrar@cbpbu.ac.in, Website : www.cbpbu.ac.in
Dr. Abdul Kader Safily
REGISTRAR

Date: 21.12.2022

MESSAGE

It is heartening that Tufanganj Mahavidyalaya is celebrating its Golden Jubilee and is publishing one Souvenir on the occasion.

Golden Jubilee marks the momentous milestone in the evolution of any institution and calls for celebration as well as deep introspection. On this historic juncture all concerned should - and I am convinced will - strive to reflect on the achievements of the college and collectively strive to take it to higher and stellar excellence in the year to come

Incidentally, I had the privilege to serve as faculty in the college for many years and I appreciate its mission and fervour in the context of rapidly changing facets of education in India.

Abdul Kader Safily.
Registrar
Registrar
Cooch Behar Panchanan Barma University

পুণ্যভূমি খলিসামারী

পঞ্চানন বর্মা মেমোরিয়াল এন্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাষ্ট

রেজি. নং ঃ 2567-IV-010/13, dated 10.06.13

খলিসামারী, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার

Date : .....

শুভেচ্ছা বার্তা

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পত্রিকার পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা, ট্রাস্ট আন্তরিকভাবে আনন্দিত। মনীষী পঞ্চানন বর্মার অনুপ্রেরণায় এবং চিন্তায় অনুপ্রাণিত ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা — ''তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের মহৎ শিক্ষাদানের মাধ্যমে বৃহত্তর ঐ অঞ্চলে শিক্ষার প্রকৃত আলোকবর্তিকা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হোক।''

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

চরৈবেতি

শ্রী গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ

সম্পাদক

Sri Avijit De Bhowmik
Director Pulpwood Development Corporation Ltd.

Pulpwood Development Corporation
Aranya Bhawan, Block LA-10A, Sector-III Salt Lake City
Kolkata, WB -700106

19th December,2022

MESSAGE

I convey my best wishes to the students, the teachers, the staff and non-teaching staff of Tufanganj Mahavidyalaya on the occasion of its Golden Jubilee celebrations.

I am sure that the College will continue to strive for imparting quality education and allround development of students.

My best wishes for future endeavours.

Avijit De Bhowmik

Avijit De Bhowmik
Director
Pulpwood Development Corporation Ltd.

Res : No.2 Kalighat Road, NEAR Shakti Sangha Club, Coochbehar, Pin- 736101#Mob:9635774459

Picture Frame of Principals of Tufanganj Mahavidyalaya

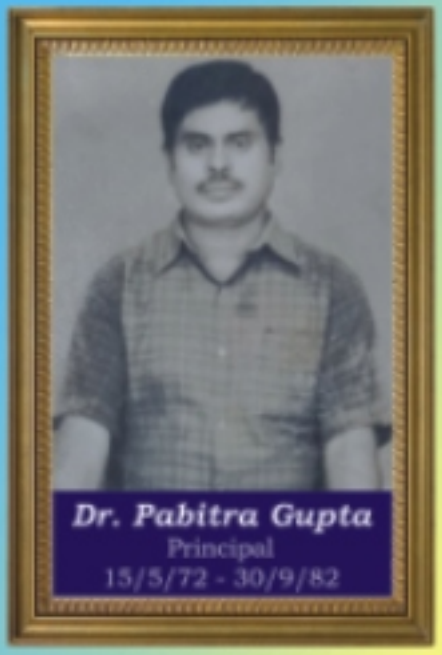

Dr. Pabitra Gupta
Principal
15/5/72 - 30/9/82

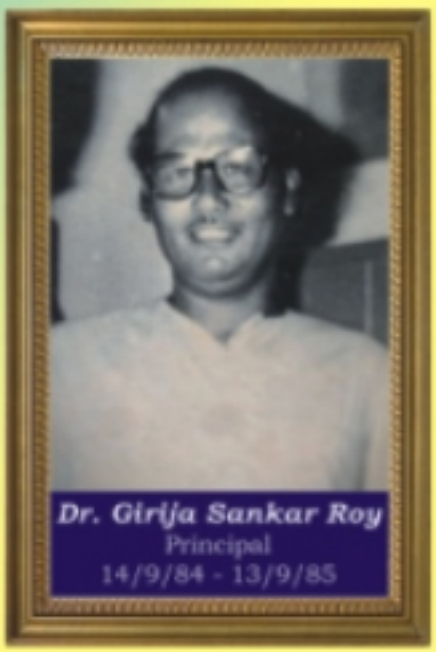

Dr. Girija Sankar Roy
Principal
14/9/84 - 13/9/85

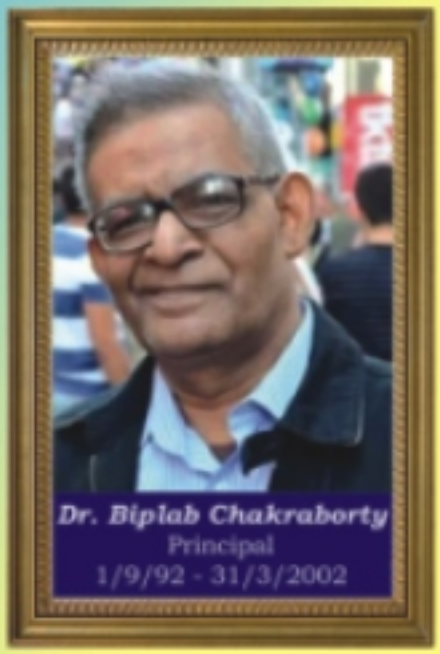

Dr. Biplab Chakraborty
Principal
1/9/92 - 31/3/2002

Dr. Debashis Chatterjee
Principal
7/1/2005 - Contd.

Picture Frame of Principal & Teaching Staff of Tufanganj Mahavidyalaya

বা দিক থেকে দাঁড়িয়ে ঃ-

অধ্যাপক দেবাশিস মিত্র, অধ্যাপক শাহ সেলিম রহমান, অধ্যাপক মুকেশ প্রধান, অধ্যাপক শিবু বর্মন, অধ্যাপক নির্মল সেউড়ি, অধ্যাপক তাপস কার্জী, অধ্যাপক প্রশান্ত পাল, অধ্যাপক সমীরণ সাহা, অধ্যাপক মানস দে, অধ্যাপক হেলাউৎউল্লা মিঞা, অধ্যাপক আশারুল হক, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ বোস, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ অধিকারী, অধ্যাপক সোমনাথ কুন্ডু, অধ্যাপক নারায়ণ সুব্রধর, অধ্যাপক তাপস বর্মন, অধ্যাপক সুরজিৎ বর্মন, অধ্যাপক দেশবন্ধু বর্মন, অধ্যাপিকা সুস্মিতা কর, অধ্যাপিকা রাজশ্রী বর্মন, অধ্যাপিকা স্বর্ণা মোদক, অধ্যাপিকা সেবন্তী রায় চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুমনা সোরেন, অধ্যাপক অশোক সরকার, অধ্যাপিকা সুস্মিতা অধিকারী, অধ্যাপিকা লক্ষ্মী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মধুমঙ্গল সাহা, অধ্যাপক দিব্যেন্দু দে

নীচে বসে বা দিক থেকে ঃ-

ডঃ ভূপেন বর্মন, অধ্যাপক রবীন্দ্র নাথ সাহা, ড. অভিষেক সাহা, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ, অধ্যক্ষ ড. দেবাশিষ চ্যাটার্জী, ড. সুলেখা পন্ডিত, ড. অঙ্কিতা মুখার্জী, ড. বাবলী রায়

Picture Frame of Non-Teaching Staff of Tufanganj Mahavidyalaya

বা দিক থেকে দাঁড়িয়ে ঃ-

শ্রীযুক্ত দীপংকর চক্রবর্তী, স্বপন সরকার, নন্দদুলাল দাস, সঞ্জীব মন্ডল, শিশির দাস, বিষ্ণু রায় সিংহ, নিতাই চন্দ্র দাস, দেবাশীষ বর্মন, সুব্রত বর্মন, গুলশান শামরীন রহমান, মায়ারাণী পন্ডিত, অনুপম চ্যাটার্জী, পায়েল সাহা, মীরাজুল হক, প্রতীক সরকার।

বা দিক থেকে নীচে বসে ঃ-

ছোটেলাল বাঁশফোর, তারিণীকান্ত সরকার, সঞ্জয় বর্মন, প্রদীপ সরকার, অপূর্ব সাহা, বিশ্বজিৎ তালুকদার, কমল দেবনাথ, ওমর আলী, সুকমল বর্মন।

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভিক পর্বের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিবৃন্দ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিবৃন্দ

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মরণে আয়োজিত একদিবসীয় আলোচনাচক্র

বসন্ত উৎসবের কিছু মুহূর্ত

সম্পাদকীয়

বিরামহীন মহাকালের রথ, মৃত্তিকায় ছাপ রয়ে যায় কালচক্রের। সময়ের ধুলো উড়িয়ে নির্মাণ হয় ইতিহাসের। রায়ডাক, কালজানী, গদাধর, সংকোষ, ঘরঘরিয়া বিধৌত ভূমি ফুলবাড়ি, বক্সিরহাট, খেরবাড়ী, চিকলিগুড়ি, বেষ্ঠিত প্রাচীন জনপদ তুফানগঞ্জ, একট বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং একদা কোচবিহার রাজ্যের বন্দর বা বাণিজ্য কেন্দ্র, বর্তমান কোচবিহার জেলার মহকুমা।

কোচ শাসনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে এই পূণ্যভূমিতেই ১৫৩৮ খ্রীঃ বীর সেনাপতি চিলারায়ের অনুরোধে তুফানগঞ্জের ফুলবাড়ী সত্রে বসে বৈষ্ণব ধর্মগুরু শঙ্করদেব লিখেছিলেন 'রামবিজয়' নাটক। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তুফানগঞ্জের রামপুরের নিকট গারদহাট এলাকার কবি ঘনশ্যাম দলাই লিখেছিলেন 'সচিত্র কুচবেহার রাজচিত্র'। সে অনেক ইতিহাস।

২০২১ সনের শেষ রেখাটুকু ক্ষীয়মান। রাজতন্ত্রের অবসানে গণতন্ত্রের পাদপীঠে আমাদের স্বাধীনতার পচাত্তরটি বছর কেটে গেছে। সময়ের উত্থান-পতনে আরো কিছুকাল, অন্তরের লালিত ইচ্ছার সুপ্রকাশ, প্রারম্ভের সংগ্রাম - অন্তহীন প্রচেষ্টা, আনন্দে, গৌরবে, প্রাপ্তিতে ১৯৭১ সনে জন্ম নিল মহকুমার উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান - তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। পঞ্চাশোত্তীর্ণ শিক্ষালয় - বহু বছরের কথাকে বুকে ধরে দন্ডায়মান। বহু কিছুর নীরব সাক্ষী।

সময়ের প্রবাহে, অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে বিজ্ঞানের অগ্রগামীতায়, আন্তর্জাতিক সুযোগ সুবিধায় সভ্যতার এই যে বিবর্তন তার উপভোক্তা আমরা। পরিবর্তনের ছন্দে শিক্ষার্থীদের বিপুল আগমন আরো বেশী বৈচিত্র্যমুখী ও ব্যস্ত করেছে আমাদের, পল্লবিত হয়েছে জ্ঞান অর্জনের ও শিক্ষণের আরো অনেক শাখা-প্রশাখা। প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চল, কেননা শিক্ষাহীন জীবন অচল।

শান্ত তরঙ্গে, নিয়মানুবর্তীতায় নিবিড় ছিলো যা তা আজ উচ্চকিত প্রকাশে কুণ্ঠাহীন। এভাবেই মহকুমার প্রথম উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রটি পঞ্চাশটি বছর অতিক্রম করেছে। কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি তাঁদের যাদের অনড় ইচ্ছা, পরিশ্রম ও সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না এই সারস্বত প্রতিষ্ঠান। স্মরণ করি জ্ঞানের আলোকবার্তা পৌছে দিতে সহায়ক হয়েছেন যারা সেই সব শিক্ষকদের ও সাথে থেকেছেন সেই শিক্ষাকর্মীদের। অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা দুর্বার ছাত্র ধারাকে - অগণিত প্রাণপ্রবাহে সমুজ্জ্বল যৌবনের দূত যাঁরা।

ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা। অতিমারী কবলিত বিশ্বের সংকটকাল, দীর্ঘ সময় ধরে আমরা উদ্বিগ্ন - এখনও। হারিয়েছি অনেক বিখ্যাত জনকে, ঘনিষ্ঠ জনকে - তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। জানি এই বিপর্যয় কেটে যাবে একদিন। বিশুদ্ধ বায়ুতে নিঃশ্বাস নেবার প্রত্যাশা। শুধু তাই নয় - পৃথিবীর শুভকামী মানুষের পাশে আমরাও। ধিক্কার জানাই ধর্মান্ধতার কুৎসিত আস্ফালনকে, বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক আগ্রাসনের অস্ত্রশক্তিকে। শাসন ও শোষণের নির্লজ্জ দাম্ভিকতাকে। পৃথিবী ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকি - আমরা ভালো থাকলে পৃথিবী মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। মানবিক আবেগ থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই।

ধন্যবাদ জানাই ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি যারা লেখা ও তথ্য সরবরাহে সমৃদ্ধ করেছেন পত্রিকাটিকে। ধন্যবাদ ব্রাইট প্রিন্টার্সের গোপালকে - নীরব, নিরলস শ্রমদানে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ স্মারক পত্রিকাটিকে।

প্রণত এই চির প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের প্রদীপ সমীপে।

- ডঃ সুলেখা পন্ডিত ও অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ

INSTITUTIONAL BACKGROUND

Dr. Debashis Chatterjee
Principal,
Tufanganj Mahavidyalaya

Tufanganj Mahavidyalaya was established in 1971 in a placid and serene atmosphere at Andaranfulbari in the Sub-Division of Tufanganj only 11.5 kms away from Indo-Bangladesh border. The area is thickly populated by the people belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Minority and Other Backwdard Classes and surrounded on all three sides by Assam and Bangladesh. Most of the learners are first generation learners and belong mostly to the poor, agrarian community, socially backward and economically subdued.

Although the college was set up in 1971, the history of its foundation dated back to 1964, when a rich businessman of Tufanganj, named Shri Sarbananda Sarkar came up with a donation of Rs. 60,000/- for establishing a college to be called after his own name. But for various reasons the proposal did not mature and the hopes for establishing a college were nipped in the bud. It was in 1967 that the then Sub-Divisional Officer, Amiya Kumar Mitra convened an assembly with the educationists and distinguished persons at the Town Hall of Tufanganj and a proposal was adopted for establishing a college at Tufanganj. A Steering Committee was formed consisting of 54 members and for successful completion of setting up a college. The College working committee was formed comprising 21 members. After selection of site or place for setting up a college at Andaranfulbari near Hirirdham by the side of Tufanganj-Dhalpal road, the college working committee directed efforts to collect donation. It was learnt from the Sub-Divisional Officer that the Cooch Behar Refugee Service (presently Luthern World Service) was eager to extend financial assistace for setting up a college on the condition that Agricultural Science and Technology would have to be taught for the cause of the farmers. After a threadbare discussion with the Cooch Behar Refugee Service on 17/12/1967 a decision was taken to establish a college named 'Tufanganj College' where Arts, Science and Agriculture would be taught.

Attempts wer then made to raise fund for construction of the College building. In the meeting of the Working committee on 21/12/1967 a budget of Rs. 20,00000/- was prepared of which the Cooch Behar Refugee Service would donate Rs. 15,00000/0 and Rs. 5,00000/- would be collected from the distinguished persons and businessman of Tufanganj. Afterward donations were collected and 19.86 acres of land were purchased at the cost of Rs. 52,956.84. The Cooch Behar Refugee Service prepared a Blue Print for a General Degree College together with Agriculture Institute for training of the farmers and started construction of the Main Building to be meant for Agricultural Institute, and not for General Degree College. Considering the gravity of the situation it was hurriedly decided that the college would be named Tufanganj College of Agriculture. In 1969 the then District Magistrate Shri Bhaskar Ghosh laid the foundation stone of the college on 26th March at 4 p.m. and with this foundation were fullfilled the long-cherished dreams of the people of Tufanganj for higher studies of their children.

Later on, the responsibility of the Farmer's Training Centre was shifted to the Department of Agriculture and as a result the name of the college as Tufanganj College and Institute of Agriculture became meaningless. So, in the meeting of the College Working

Committee on 10/2/1971 the college was re-named as Tufanganj College and decision was adopted in the same meeting to move the University of North Bengal and Govt. of West Bengal for necessary affiliation and approval. The Executive Council in its meeting on 4/5/71 decided to visit the college and inspection team came on 28/6/71 and was satisfied with the goings on of the college. The University authority in its meeting on 28/8/71 decided to move the Govt. for necessary approval and directed the college authority to raise rserved fund of Rs. 45,000/-. The college working committe in its meeting on 17/11/71 found the glimmer of hope and decided to start the college from 1971-72 academic session and resolved to appoint one principal, seven professors, one Librarian, one Clerk, two Peons, ond Night Guard and one Sweeper. Before appointment of Principal, Prof. Arun Kumar Chakraborty joined the post of Lecturer in-charge. The college working committee in ints meeting on 8/12/71 felt encouraged and determined the date for inauguration of the college. Finally, on 23rd December in 1971 the college was inaugurated by the then District Magistrate Shri B.B. Sharma and thus opened up new vista for prosecuting higher studies in Tufanganj.

On the day after inauguration (i.e., 24/12/71) the Department of Higher Education, Govt. of West Bengal, accorded permission vide its Memo No. 2264-Edn(CS) and the University of North Bengal extended affiliation on 12/1/72 vide Memo No.- 145/R-72 and introduced pre-University and B.A. Degree Courses in Bengali, English, Economics, Political Science, History, Philosophy and Sanskrit. The academic journey of the college started on 5th January, 1972 with 48 students of Pre-University and 38 student of B.A. classes and it was in 1972 that the first Governing Body was formed with Shri Sudhendu Sircar (S.D.O.) as the president (15/5/72). Efforts were then made to obtain UGC Registration under sectiion 2(f) for development grant. So, the process was initiated to prepare Memorandum. The Memorandum was approved by the University and as per the Memorandum the college was re0named 'Tufanganj Mahavidyalaya' w.e.f. 10/7/75. The college was registered in Registration Society Act on 10/11/75 and the University Grants Commission enlisted the college under sectioin 2(f) on 3/1/77 vide memo no.- F, 8-6876(c.p.) As a result the college was entitled to get basic and developmental assistance from U.G.C. and proposal was submitted for obtaining grants under the 5th five year plan.

Efforts were then made to motivate the students for social and benevolent works. With this end in view NSS was introduced from the 1967-77 academic session and from 1979-80 the Boy's' NCC was introduced. Honours Courses in Political Science and B.Com as General Course were introduced from 1981-82 sessions. From 1991-92 session was introduced Girls' NCC. Later on, affiliation was extended for introduction of Science as General course from 1994-95 session and from 1995-96 were introduced Bengali Honours and Sociology Honours Course. In 2005 affiliation was entended to English Honours Course and was effective from 2005-06 academic session. In 2007 the college went in for 1st cycle NAAC assessment. The NAAC peer team visited the college on 24/3/07, 25/3/07 & 26/3/07 and accredited with B+ grade which bore testimony to the academic excellence of the college in terms of the changing pattern of Higher Education in the sphere of globalization.

Later on, efforts wer made and several Honourse Courses were introduced in the subsequent years as shown in the following table -

Academic Session	General Course	Honours Cours
2005-06		English
2007-08		Sanskrit, Zoology
2008-09		Philosophy, Botany
2009-10		Geography
2012-13	Mathematics	Economics
2013-14	Physics	
2014-15	Education	
2016-17		Chemistry

In 2012 Cooch Behar Panchanan Barma University was established and the college was affiliated to this University w.e.f. 30th July, 2015 vide Memo No.- CBPBU/164 dated 31/7/2015 read with Govt. Notification No.- 746-Edu(U)/1U(CB)-02/15 dated 30/7/2015.

In fine, the college authority from its very inception left no. stone unturned to promote academic excellence and mete out quality education to the learners who hail mostly from the SC/ ST/ OBC/ Minority Community and belongs to the poor, agrarian classes. The college has at prsent three major buildings. Main Building, Library Building & Science Building, two play grounds and five staff quarters. The first floor of the Science Building was provided to Jawahar Navodaya Vidyalaya in 2006 and the Girls' Hostel is now being used by the student of JNV for residential purpose.

প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী, ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের হাতে মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা তুলে দিতে পেরে ছাত্র-ছাত্রী সংসদ -এর পক্ষ থেকে আমরা গর্ব এবং আনন্দ অনুভব করছি। এই প্রকাশের মাধ্যমেই নিহিত রয়েছে নিজেকে মেলে ধরার আন্তরিক আনন্দানুভূতি। এই অনুভূতি আকাঙ্খিত করেছে সাহিত্যকে ভালোবাসতে। পত্রিকার মাধ্যমেই এই প্রকাশ অন্যতম ভাবে প্রতিফলিত হয়। আমি বিশ্বাস করি নিজেকে ভালো রাখা ও মানুষকে ভালো রাখার জন্য সততার মধ্যে দিয়ে জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে।

কামনা করছি এই পত্রিকা হয়ে উঠুক শিক্ষার, প্রগতির। সবার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সংঘবদ্ধ জীবন - জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এক সঙ্গে চলা। জাগরুক থাক দেশপ্রেম ও মানুষকে ভালোবাসা।

সমীর দাস

সাধারণ সম্পাদক,

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ

Tufanganj Mahavidyalaya

Members of the Governing Body

1. ***Shri Ananta Kr. Barma***
   - (Advocate) President
2. ***Dr. Debasish Chatterjee***
   - Principal & Secretary, Tufanganj Mahavidyalaya
3. ***Shri Chand Mohan Saha***
   - West Bengal State Council of Higher Education Nominee
4. ***Shri Pankaj Ghosh***
   - Govt. Nominee
5. ***Shri Jitendra Saha***
   - Govt. Nominee
6. ***Prof. Laltu Barman***
   - Member, University Nominee
7. ***Dr. Babli Roy***
   - Member, Teacher's Representative
8. ***Prof. Tapas Barman***
   - Member, Teacher's Representative
9. ***Sri Avijit Karmakar***
   - Member, NTS Representative
10. ***Shri Samir Das***
    - General Secretary, Students' Union, Tufanganj Mahavidyalaya

Tufanganj Mahavidyalaya

List of Principal / Teacher-in-charge

	Name	Designation	Period of Service
1.	Shri Arun Kr. Chakraborty	Teacher in-charge	3.12.71-8.1.72
2.	Shri Santosh Kr. Saha	Teacher in-charge	9.1.72-14.5.72
3.	Dr. Pabitra Kr. Gupta	Principal	15.5.72-30.9.82
4.	Shri Santosh Kr. Saha	Teacher in-charge	1.10.82-13.9.84
5.	Dr. Girija Sankar Roy	Principal	14.9.84-13.9.85
6.	Shri Amal kr. Chakraborty	Teacher in-charge	14.9.85-4.2.92
7.	Shri Ajay Kr Saha	Teacher in-charge	5.2.92-31.8.92
8.	Dr. Biplab Chakraborty	Principal	1.9.92-31.3.02
9.	Shri Ajay Kr. Saha	Teacher in-charge	1.4.02-10.10.02
10.	Shri Sultan Lal Barman	Teacher in-charge	11.10.02-6.1.05
11.	Dr. Debashis Chatterjee	Principal	7.1.05 - cont.

Tufanganj Mahavidyalaya

List of the General Secretary of the Students' Union

Sl No.	Name	Academic year
1.	Shri Mrinal Kanti Sarkhen Ratan Saha	1972-73 & 74-75
2.	Shri Debendra Nath Barma	1975-76 & 76-77
3.	Shri Kumar Manikendra Narayan	1977-78
4.	Shri Shyamal Ch. Das	1978-79
5.	Shri Radhanakta Barman	1979-80
6.	Student Union Conducted by Principal & Teachers	
7.	Shri Amjad Hossain	1981-82 &1982-83
8.	Shri Pallab Bhowal	1983-84
9.	Shri Subhash Das	1984-85
10.	Shri Madan Banerjee	1985-86
11.	Shri Jagadish Laskar	1986-87
12.	Shri Ajoy Bagchi	1987-88
13.	Shri Ramesh Das	1988-89 &1989-90
14.	Shri Pradip Sarkar	1990-91
15.	Shri Pradip Kr. Barma	1991-92
16.	Shri Sankar Dey	1992-93
17.	Shri Subasish Guha Roy	1994-95
18.	Shri Tapan Sen	1995-96
19.	Shri Dhananjoy Sarkar	1996-97
20.	Shri Bibek Sarkar	1997-98
21.	Shri Dhananjoy Sarkar	1998-99
22.	Shri Paban Barman	1999-20 &2001-02
23.	Shri Palash Ch. Sarkar	2002-03
24.	Shri Dhanabindu Roy	2003-04
25.	Shri Nirmalendu Sarkar	2004-05 &2005-06
26.	Md. Manirul Haque	2006-07
27.	Shri Sahadeb Sarkar	2007-08
28.	Shri Prasenjit Roy Karmakar	2008-09
29.	Mirajul Haque	2009-10
30.	Shri Gobinda Adhikary	2010-11
31.	Shri Tapas Barman	2010-11
32.	Shri Ramkumar Rabidas	2011-12
33.	Shri Tanu Sen	2012-13
34.	Shri Tanu Sen	2013-14
35.	Shri Shuvam Sarkar	2014-15
36.	Shri Binoy Roy (CT)	2015-16
37.	Rashidul Miah	2016-17
38.	Shri Prodip Barman (CT)	2017-18
39.	Shri Samir Das	2019-20 &2020-21

Tufanganj Mahavidyalaya

List of Teaching Staff

অধ্যক্ষ ঃ ড. দেবাশীষ চ্যাটার্জী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ–

১। ড. অমল মন্ডল, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

২। অধ্যাপক সুলতান লাল রহমান, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

৩। অধ্যাপক নারায়ণ সূত্রধর, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

সমাজবিদ্যা ঃ–

১। অধ্যাপিকা সায়নী বিশ্বাস, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

২। শ্রী সন্তোষ কুমার সাহা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৩। শ্রী শীমুল চন্দ্র দাস, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

বাংলা ঃ–

১। ড. সুলেখা পন্ডিত, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

২। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। ড. অঙ্কিতা মুখার্জী, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৪। শ্রী শশাঙ্ক শেখর গাঙ্গুলী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। শ্রী সরোজিৎ সাহা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

সংস্কৃত ঃ–

১। মহঃ হেদায়েত উল্লা মিঞা, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। অধ্যাপক তাপস বর্মন, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রীমতি নিবেদিতা চক্রবর্তী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শ্রীমতি সুস্মিতা অধিকারী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। শ্রীমতি রাজশ্রী বর্মা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৬। শ্রীমতি ঝর্ণা মোদক, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

ইংরাজী ঃ–

১। অধ্যাপক তুহীন সান্যাল, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। অধ্যাপিকা সেবন্তী রায় চৌধুরী, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রী অশোক সরকার, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শ্রী নির্মল দেউরী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। অধ্যাপক মহ. আহারুল হক, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

ইতিহাস ঃ–

১। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ অধিকারী, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। অধ্যাপক রবীন্দ্র নাথ সাহা, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রী মধুমঙ্গল সাহা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শ্রীমতি পাপিয়া সেন, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। শ্রী স্বপন দে, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

ভূগোল ঃ–

১। অধ্যাপক দেশবন্ধু বর্মন, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। ড. ভুপেন বর্মন, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। আবুল কালাম আজাদ, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শাহ সেলিম রহমান, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। শ্রী অমরদীপ রায়, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

অর্থবিদ্যা ঃ–

১। অধ্যাপক কাশীকান্ত বর্মন, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। ডঃ সিদ্ধার্থ শংকর লাহা, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর (বর্তমানে লিয়েনে আছেন)

দর্শন ঃ–

১। ড. সঙ্গীতা রাহা, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। অধ্যাপিকা সুমনা সোরেন, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রীমতি লক্ষ্মী ভট্টাচার্য্য, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শ্রীমতি সুস্মিতা কর, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

বাণিজ্য ঃ–

১। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ বসু, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। শ্রী সুভাষ সাহা, ইনভাইটি টিচার

রসায়ণ ঃ–

১। ড. অভিষেক সাহা, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

২। ড. বাবলি রায়, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রী সমীরণ সাহা, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

প্রাণীবিদ্যা ঃ–

১। ড. দেবাশীষ দাস, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

২। অধ্যাপক সোমনাথ কুন্ডু, এ্যাসিস্ট্যন্ট প্রফেসর

৩। শ্রী দেবাশীষ মিত্র, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৪। শ্রীমতি সুদীপ্তা ভৌমিক, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

৫। শ্রী দিব্যেন্দু দে, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

পদার্থবিদ্যা ঃ–

১। শ্রী সুকেশ প্রধান, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

২। শ্রীমতি নিকিতা ঘোষ, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

শারীরবিদ্যা ঃ–

১। শ্রী সুরজিৎ বর্মন, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

২। শ্রীমতি বনশ্রী রায় সরকার, ইনভাইটি টিচার

পরিবেশ বিদ্যা ঃ–

১। শ্রী রথীন বসাক, ইনভাইটি টিচার

২। শ্রীমতি পিংকী বর্মন, ইনভাইটি টিচার

উদ্ভিদ বিদ্যা ঃ–

১। ডঃ শিবু বর্মন, এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

২। শ্রী প্রশান্ত পাল, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

এডুকেশন ঃ–

১। শ্রীমতি রুমা বর্মন, ইনভাইটি টিচার

২। শ্রী কুমার কল্যাণ নারায়ণ বর্মা – ইনভাইটি টিচার

গণিত ঃ–

১। মানস দে, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার

লাইব্রেরী ঃ-

১। শ্রী সাগর শের্পা – লাইব্রেরীয়ান

Tufanganj Mahavidyalaya

List of Non-Teaching Staff

১। শ্রী বিশ্বজিৎ তালুকদার – হেড ক্লার্ক

২। শ্রী অপূর্ব সাহা – এ্যাকাউনটেন্ট

৩। শ্রী মঙ্গল রাভা – ক্যাশিয়ার

৪। শ্রীমতি পায়েল সাহা – ক্লার্ক

৫। গুলশন সামরিন রহমান – ক্লার্ক

৬। শ্রী প্রদীপ বর্মন – ক্লার্ক

৭। শ্রী প্রদীপ সরকার – এন.সি.সি. পার্ট টাইম ক্লার্ক ও ক্যাজুয়াল ক্লার্ক

৮। শ্রীমতি ঝর্ণা বর্মা – গ্রুপ ডি

৯। শ্রী ছোটেলাল বাসফোর – সাফাই কর্মী

১০। শ্রী কমল দেবনাথ – স্কিলড্ ল্যাবরেটরী এ্যাটেনডেন্ট

১১। মহঃ ওমর আলী – স্কিলড্ ল্যাবরেটরী এ্যাটেনডেন্ট

১২। শ্রী স্বপন কুমার রাভা – মালী

১৩। শ্রী তারিণী কান্ত সরকার – জেনেরেটর/ পাম্প/ গ্যাস প্লান্ট অপারেটর কাম মেকানিক

১৪। শ্রী গণেশ চন্দ্র সরকার – নাইট গার্ড

১৫। শ্রী নন্দদুলাল দাস – গ্রুপ ডি

১৬। শ্রী অভিজিৎ কর্মকার – ল্যাবরেটরি অ্যাটেনডেন্ট

১৭। শ্রী দিনবন্ধু সরকার – গার্ড

১৮। শ্রী শিশির দাস – গ্রুপ ডি (লাইব্রেরী)

১৯। শ্রীমতি তরুলতা দাস – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২০। শ্রী দীপংকর চক্রবর্তী – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২১। শ্রী সঞ্জয় বর্মন – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২২। শ্রী সুকমল বর্মন – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২৩। শ্রী অনুপম চ্যাটার্জী – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২৪। শ্রী মিরাজুল হক – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২৫। শ্রী সঞ্জীব মন্ডল – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল)

২৬। শ্রী প্রতীক সরকার – ক্লার্ক (ক্যাজুয়াল) (লাইব্রেরী)

২৭। শ্রী বিষ্ণু রায় সিং – সিকিউরিট গার্ড (ক্যাজুয়াল)

২৮। শ্রীমতি মায়ারাণী পন্ডিত – ল্যাবরেটরি এ্যাসিস্ট্যন্ট (ক্যাজুয়াল)

২৯। শ্রী নিতাই চন্দ্র দাস – গ্রুপ ডি (ক্যাজুয়াল)

৩০। শ্রী স্বপন সরকার – গেটম্যান (ক্যাজুয়াল)

৩১। শ্রী দেবাশীষ বর্মন – ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্ট – জিওগ্রাফি (ক্যাজুয়াল)

Tufanganj Mahavidyalaya

Core Committee of Golden Jubilee Committee

1. ***Shri Ananta Kumar Barma,***
   - President, Governing Body
2. ***Dr. Debashis Chatterjee,***
   - Principal, Tufanganj Mahavidyalaya (Convenor)
3. ***Prof. Sultan Lal Rahaman,***
   - Asso. Prof. in Pol. Sc., Member, G.B.
4. ***Dr. Sulekha Pandit,***
   - Asso. Professor, Bengali.
5. ***Prof. Dwijendra Nath Singha,***
   - Asstt. Prof. in Bengali
6. ***Dr. Sidhartha Sarkar Laha,***
   - Asstt. Prof. in Economics
7. ***Shri Brajadulal Paul,***
   - Ex Head Clerk of Tufanganj Mahavidyalaya
8. ***Shri Santosh Saha,***
   - SACT in Sociology
9. ***Shri Biswajit Talukder,***
   - Head Clerk
10. ***Late Dolendra Barman,***
    - Member G.B. (Expired on 27-8-21)
11. ***Shri Samir Das***
    - G.S. Students' Union, Tufanganj Mahavidyalaya

FINANCE COMMITTEE -

1. Prof. Sultan Lal Rahaman - Convener
2. Dr. Sirdhartha Sankar Laha - Member
3. Prof. Dwijendra Nath Singha - Member
4. Shri Santosh Saha - Member
5. Shri Biswajit Talikder - Cashier
6. Shri Dinabandhu Sarkar - Asstt. Cashier
7. Shri Apurba Saha - Member
8. Shri Dalendra Barman - Member
9. Shri Samir Das - Member
10. Shri Biswajit Bose - Member

SOUVENIR COMMITTEE -

1. Dr. Sulekha Pandit - Joint Convener
2. Prof. Dwijendra Nath Singha - Joint Convener
3. Dr. Amal Mandal - Member
4. Prof. Ankita Mukherjee - Member
5. Dr. Sidhartha Sankar Laha - Member
6. Prof. Tuhin Sanyal - Member
7. Prof. Tapas Barman - Member
8. Prof. Sebanti Roy Choudhury - Member
9. Shri Sagar Sherpa - Member
10. Smt. Jharna Modak - Member
11. Shri Anup Kumar Barman - Member
12. Shri Manas Dey - Member
13. Shri Sarojit Rava - Member
14. Shri Tapas Karjee - Member
15. Shri Brajadulal Paul - Member
16. Shri Charitra Debnath - Member
17. Smt. Payel Saha - Member
18. Shri Dipankar Chakraborty - Member
19. Shri Pratik Sarkar - Member
20. Shri Sukamal Barman - Member
21. Shri Sisir Das - Member
22. Shri Samir Das - Member

CULTURAL COMMITTEE -

1. Dr. Sulekha Pandit - Joint Convener
2. Prof. Ankita Mukherjee - Joint Convener
3. Prof. Dwijendra Nath Sigha - Member
4. Shri Swapan Dey - P.O., N.S.S. Unit-I - Member
5. Prof. Tapas Barman - P.O., N.S.S. Unit-II - Member
6. Prof. Bhupen Barman - N.C.C. Officer (Boys) - Member
7. Prof. Sayoni Biswas - N.C.C. Officer (Girls) - Member
8. Shri Debasish Kumar Mitra - Member
9. Shri Prasanta Paul - Member
10. Smt. Susmita Kar - Member
11. Shri Surojit Barman - Member
12. Gulshan Shamrin Rahaman - Member
13. Smt. Jharna Barma - Member

14. Shri Kamal Debnath - Member
15. Shri Tarini Kanta Sarkar - Member
16. Shri Pradip Sarkar - Member
17. Shri Sanjoy Barma - Member
18. Shri Anupam Chatterjee - Member
19. Shri Nitai Chandra Das - Member
20. Smt. Maya Rani Pandit - Memeer
21. Shri Bishnu Roy Singha - Membe
22. Shri Samir Das - Member
23. Sasanka Sekhar Ganguly - Member

ALUMNI COMMITTEE -

1. Prof. Dwijendra Nath Singha - Joint Convener
2. Prof. Biswajit Adhikary - Joint Convener
3. Shri Santosh Saha - Member
4. Shri Ashok Sarkar - Member
5. Shri Swapan Dey - Member
6. Smt. Papiya Sen - Member
7. Smt. Laxmi Bhattacharya - Member
8. Shri Sunil Chandra Das - Member
9. Smt. Jharna Modak - Member
10. Shri Biswajit Talukder - Member
11. Shri Apurba Saha - Member
12. Shri Pradip Sarkar - Member
13. Shri Pradip Barman - Member
14. Shri Mangal Rava - Member
15. Md. Omar Ali - Member
16. Shri Kamal Debnath - Member
17. Shri Ganesh Sarkar - Member
18. Shri Dinabandhu Sarkar - Member
19. Shri Avijit Karmakar - Member
20. Shri Sisir Das - Member
21. Smt. Tarulata Das - Member
22. Shri Dipankar Chakraborty - Member
23. Shri Pratik Sarkar - Member
24. Shri Anupam Chatterjee - Member
25. Mirajul Haque - Member
26. Shri Sanjib Mandal - Member
27. Shri Subrata Barman - Member
28. Shri Samir Das - Member

RECEPTION COMMITTEE -

1. Dr. Debashis Chatterjee
   - Principal & Secretary,
   Golden Jubilee Celebration Committee - Member
2. Prof. Sultan Lal Rahaman - Joint Convener
3. Dr. Debashis Das - Member
4. Prof. Abhisek Saha - Member
5. Dr. Sanghamitra Chowdhury - Member
6. Dr. Babli Roy - Member
7. Prof. Somnath Kundu - Member
8. Prof. Shibu Barman - Member
9. Prof. Kashi Kanta Barman - Member
10. Prof. Deshbandhu Barman - Member
11. Shri Prasanta Paul - Member
12. Saha Salim Rahaman - Member
13. Shri Amardip Roy - Member
14. Smt. Nikita Ghosh - Member
15. Smt. Jharna Barma - Member
16. Mirajul Haque - Member
17. Smt. Maya Rani Pandit - Member
18. Shri Samir Das - Member

REFRESHMENT COMMITTEE -

1. Shri Ashok Sarkar - Convener
2. Dr. Sangita Raha - Member
3. Prof. Narayan Sutradhar - Member
4. Shri Madhu Mangal Saha - Member
5. Abul Kalam Azad - Member
6. Shri Chhotelal Bansfore - Member
7. Shri Swapan Kumar Rava - Member
8. Shri Nanda Dulal Das - Member
9. Shri Dalendra Barman - Member
10. Smt. Tarulata Das - Member
11. Shri Subrata Barman - Member
12. Shri Swapan Sarkar - Member
13. Shri Samir Das - Member

GOLDEN JUBILEE SEMINAR COMMITTEE -

1. Dr. Amal Mandal - Join Convener
2. Dr. Sidhartha Sankar Laha - Joint Convene
3. Dr. Debashis Das - Member
4. Prof. Abhisek Saha- Member
5. Dr. Babli Roy - Member
6. Dr. Sangita Raha - Member
7. Prof. Susna Subha - Member
8. Prof. Deshbandhu Barman - Member
9. Prof. Narayan Sutradhar - Member
10. Prof. Hedayet Ulla Miah - Member
11. Prof. Somnath Kundu - Member
12. Prof. Aharul Haque - Member
13. Prof. Sumana Soren - Member
14. Prof. Biswajit Bose - Member
15. Shri Nirmal Dewry - Member
16. Smt. Nivedita Chakraborty - Member
17. Smt. Rajasree Barma - Member
18. Smt. Susmita Adhikary - Member
19. Smt. Sudipta Bhowmik - Member
20. Shri Mukhesh Pradhan - Member
21. Shri Samiran Saha - Mendal
22. Shri Dibyedu Dey - Member
23. Shri Sanjib Madal - Member
24. Shri Samir Das - Member

TRYST WITH OLIVES

Lieutenant Sayoni Biswas
ANO, 7 Bengal NCC Girls Battalion
Tufanganj Mahavidyalaya Unit

My life as a small girl was around my near and dear ones in the folds of the Dooars, the alluvial flood plains, in the eastern-northeastern India, that lie south of the outer foothills of the Himalayas and north of the Brahmaputra river basin. Never in my dreams, I would have imagined myself to be in the world of Olives. The journey began when I joined Tufanganj Mahavidyalaya, as an assistant professor in Sociology.

(With a smile), I still remember, two years back, it was the annual meeting at the institution, where I teach. And suddenly, Principal Sir announced my name, as the Care Taking Officer, who would take charge of the concerned unit for girls, at the college, which serves my bread.

Then, I was reluctant, hesitant, nervous and most importantly, I was ignornat about this OLIVE GREEN WORLD. I didn't know where to begin from and how to deal with the cadets. A few queries were haunting me. Of which, one such query was, 'will the cadets accept me?' (SIGH !!!) And today, resting on my chair, as I sit back to pen down my journey in this world, I smile and say to myself, Where do I begin from?'

Well, let me share, my three months journey in officers Training Academy, Gwalior. Prior to three months journey, I had an interest in NCC and carried lay man's knowledge,. Basically, I was a kind of ignorant about this OLIVE GREEN Society.

But journey to OTA, Gwalior for three months, gave me a different perspective about National Cadet Corps, It was, 15th of December, 2019, when I stepped in the world of defence and for the first time, I realized that a single wall and a giant gate segregated us, from the civil world. Initially, it was really tough. But gradually, this tough journey happened to be a part of my life. I was gradually getting accustomed to the daily chores and activities and was gradually embracing it, out of love. This would not have been possible, if I didn't have some loving roommates, a fatherly Commanding Officer and strict but caring trainers.

OTA, made me realize a lot what I didn't think of or realize was about thirty years. Today, when I delve into the memories of OTA, Gwalior, I realize as a person, it has changed me a lot. I have realized, the essence of team spirit. The feel of putting on the team's jersey and playing for your team, is an inexplicable feeling. The grief when the team loses, because of you. The joy, when the team wins because of you. Cheering up for your team. Fun and frolic with your room mates and most importantly, the realization, that the entire building, which happened to be our abode, hend 144 of us, from different corners of our metherland, will give one goose bumps.

Ninety days, have really played a pivotal role in my life. It has given me all such experiences, which I count not even dream of experiencing it, in all these years. From getting washed out on the first day of shooting to scoring 36 out of fifty, on the final day, performing dance to a tune, whose language is Greek to me, never matttered, it was a mixed feeling. Pitching tent that too in silence, spending a night in teh tents pitched by the trainees, going out for a trekking. All these experiences, I would not have had, had I not been there.

Moreover, the phrase, 'UNITY IN DIVERSITY' what actually means, is what, I understood in my ninety days training of OTA, Gwalior. It was here, 144 of us, from different

culture, communities, in precise, from every nook and corner of India, got united and performed the same activities everyday. The fun of preparing cuisines togethe in one kitchen, and having ethnic dishes from different part of the nation in one plate is a lifetime experience. Had I not been a trainee at OTA, Gwalior, I would have missed the opportunity of visiting the air force station, Gwalior and most importantly, would miss witnessing the Mirage 2000 Squadrons. Very few rather, the lucky ones get such an opportunity. Yes, all the experience have been possible, because of OTA.

Apart from such, beautiful moments and experiences, National Cadet Corps has given me a different identity, a unirorm, which the only fortunate ones get to drape, the rank, LIEUTENANT' which was beyond my thinking. And, yes, the most important of all, my loving and supportive cadets, without whom, my identity as an Associate NCC Officer would be immaterial, NCC has taught me the real meaning of UNITY and DISCIPLINE, the motto of NCC.

Today, when I compare CTO Sayoni Biswas to ANO Lt. Sayoni Biswas, I can very well diferentiate between the two. The later one is far more confident, she can speak for herself today with boldness and confidence. She no longer considers hereself, as a being, carrying Layman's knowledge about NCC.

In a nutshell, I can only say, every student must be encouraged to be a part of NCC. It not only helps one to grow as a better human being but also gives one an opportunity to serve her society. Every parent must be made aware about such an organization. If in two yers, I can feel the difference in me, in terms of confidence, responsibility, commitment, patriotism ; then I am sure every child if encouraged and given an opportunity to be a part of NCC and if properly guided, and encouraged in different activities and coluntary services of the society will surely turn out to be a responsible, smart, committed and confident citizen.

Today, as an ANO, I have taken the responsibility of constantly encouraging my cadets in every possible way so that, they can achieve their targets to some extent if not fully. I am a proud ANO of my eligible and respobsible cadets who have started to learn the art of flying with different colours. One of my training officers said, 'YOUR IDENTITY AS AN ANO MATTERS AS LONG AS YOU HAVE CADETS BEHIND YOU. THOSE STARS ON YOUR BOTH SHOULDERS WILL HAVE VALUE, ONLY IF YOU CAN ENRICH AND ENCOURAGE YOUR CADETS WITH KNOWLEDGE.'

মহাবিদ্যালয়ের এন.সি.সি. নিয়ে কিছু কথা

প্রদীপ সরকার,
এন.সি.সি., পার্ট টাইম ক্লার্ক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

ভারত আমার জন্মভূমি, ভারত আমার মা। এই দেশ সাম্রাজ্যবাদীদের নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নয়, এখানে স্থান হবে না কোন সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের, জায়গা হবে না কোন উগ্রপন্থীর। এই সত্যকে উপলব্ধি করে শৃঙ্খলা, একতা ও শান্তি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের এন.সি.সি. ক্যাডেটরা এগিয়ে চলেছে। উচ্চশিক্ষা লাভের সাথে সাথে দেশমাতৃকার সেবায় দেহ, মন ও শরীর গড়ে তোলার প্রথম সোপান এন.সি.সি, এয়ার ফোর্স, নেভি ও আর্মি - এই তিনটি উইং নিয়ে সমর শিক্ষার্থী বাহিনী। এন.সি.সি কি? কেন গঠন করা হয়? এর উদ্দেশ্য কী? ক্যাডেটদের এটা অবশ্যই জানতে হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৭) প্রচুর সৈনিকের মৃত্যু হয়। ভারতে তখন ছিল বৃটিশ শাসন। তখন থেকে বৃটিশরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে এন.সি.সি. গঠন করার চিন্তা ভাবনা করেছিল। অবশ্য তখনও এন.সি.সি. নামকরণ হয়নি। স্বাধীন ভারতে এন.সি.সি. চালু হয় - মাননীয় প্রধান মন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সময়কালে ১৯৪৮ সালের ১৬ই জুলাই।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে অনেক প্রচেষ্টার পর, অনেক চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবশেষে ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষে DPI, Govt. of West Bengal থেকে 5/13 Bengal Bn. NCC -এর ইউনিট খোলার অনুমোদন পাওয়া গেল। প্রফেসর অসিত কুমার রায় প্রথম এন.সি.সি. কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৮১ সালে Pre-Commision Course করেন Officers Training School, Kamptee, Nagpur থেকে। দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রায় ছয় বৎসর এই দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি গৌরমোহন কলেজ, কলকাতায় যোগদান করেন। প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মহাবিদ্যালয় এই সাফল্য লাভ করে। তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিপত্র লিখতে শুরু করেন। ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত এবং প্রোফেসর অসিত কুমার রায় মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া হয়তো এই সাফল্য আমরা পেতাম না। তুফানগঞ্জের ছাত্র সমাজ কোনদিন তাদের কথা ভুলতে পারে না। আমরা তাদের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। এরপর কিছুদিনের জন্য প্রফেসর অজয় কুমার সাহা, সংস্কৃত বিভাগ, সি.টি.ও হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন।

আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত আছে। ১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনো ছাত্র, কখনো ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। আর ১৯৯৮ সাল থেকে এন.সি.সি., পার্ট টাইম ক্লার্ক এবং ২০০৬ থেকে মহাবিদ্যালয়ের একজন Casual Whole Tiem Clerk হিসেবে কাজ করে চলেছি। মনে হয় জেলাতে এই Part Time Clerk of NCC একটিও নেই। আর বেতনের পরিমাণ না বলাই ভালো। তবে আমার মনে হয় এন.সি.সি. তে Part Time নয়, একজন Whole Time Clerk দরকার।

১৯৮১ সালে Company Commander হিসাবে ডঃ হরিগোপাল মল্লিক ইউনিটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। Officer Training Academy, Kamptee, Nagpur, Orgainzed by the Ministry of Defence, Govt. of India থেকে ট্রেনিং করেছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮৮, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৮ সালে পরপর তিনটি Refresher Course করে Lieutnant, Captain and Major পদ লাভ করেন। একজন ছাত্র ও শিক্ষাকর্মী হিসাবে অনেক কাছ থেকে মেজর ডঃ হরিগোপাল মল্লিক স্যার কে দেখেছি। দেখেছি রাতের পর রাত জেগে তাকে কাজ করতে। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, কর্তব্য পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান একজন অফিসার। প্রায় ২৫ বৎসর তিনি এন.সি.সি. বয়েজ ইউনিট দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। মনেপড়ে তার নেতৃত্বে ২রা মার্চ ২০০৬ এন.সি.সি. বয়েজ ইউনিট -এর সিলভার জুবিলি সেলিব্রেশন, মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সেই সময় সাহায্যের হাত যেমন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রফেসর সন্তোষ কুমার সাহা টিচার ইন চার্জ, প্রফেসর অমল কুমার চক্রবর্তী, টিচার ইন চার্জ, ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, প্রফেসর অজয় কুমার সাহা, টিচার ইন চার্জ, প্রফেসর সুলতান লাল রহমান, টিচার ইন চার্জ, তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতার কথা মহাবিদ্যালয়ের এন.সি.সি. ক্যাডেট এবং ছাত্র সমাজ মনে রাখবে। Prof. Sultan Lal Rahaman এখনো মহাবিদ্যালয়ে Department of Political Science -এ

কর্মরত রয়েছেন এবং Bursar পদ দক্ষতার সাথে পালন করছেন।

বর্তমান বড়বাবু মাননীয় বিশ্বজিৎ তালুকদার মহাশয়ের সঙ্গে মেজর ডঃ মল্লিক স্যার -এর নেতৃত্বে মহকুমার ২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, কোচবিহার পৌরসভা এবং স্থানীয় বড় ব্যবসায়ীদের নিকট আমরা পৌছে গিয়েছিলাম -এর প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য। বড়বাবু মাননীয় বিশ্বজিৎ তালুকদার মহাশয় ছিলেন , তিনি পরিশ্রমি ও দায়িত্ববান। সর্বতোভাবে তিনি সহযোগিতা করেন। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২ তার অবসর নেওয়ার দিন। তার অবসর জীবনের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সেই সময় Governing Body-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাননীয় শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তার মত একজন বুদ্ধিজিবী মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতা আমরা পেয়েছিলাম।

N.C.C. Silver Jubilee Celebration সুন্দর ও সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে আর একজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন বর্তমান প্রিন্সিপাল, ডঃ দেবাশিষ চ্যাটার্জী মহাশয়, তার উদ্যোগ ও ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া মোটেও সম্ভব ছিল না এই অনুষ্ঠান করা। এখনও তিনি এন.সি.সি. -এর সমস্ত প্রোগ্রাম ও এ্যাক্টিভিটি তদারকি করেন ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন। তিনি ২০০৫ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেই সময় থেকে মহাবিদ্যালয়ের যেমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তেমনি জেলার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয়কে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। মহকুমার সমস্ত এন.সি.সি. ক্যাডেট এবং ছাত্র সমাজের কাছে তিনি অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

২০১০ সালে মেজর ডঃ হরিগোপাল মল্লিক অবসর গ্রহণ করার পর C.T.O. হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন ডঃ সিদ্ধার্থ শঙ্কর লাহা, অর্থনীতি বিভাগ। তার সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি তিনি খুবই সহজ সরল ও কঠোর পরিশ্রমী এবং ছাত্রদরদী। ছাত্রদের টিফিন খাইয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা ইকোনোমিক্স ক্লাস করতেন। কোন ছাত্র ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ খবর নিতেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিপদে ছুটে আসতেন। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকোনোমিক্স বিভাগে কর্তব্যরত আছেন। আমরা তার সুস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরবর্তীতে ২০১৭ সালে C.T.O. হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন প্রোফেসর নারায়ণ সূত্রধর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। তিনি ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে এন.সি.সি. ট্রেনিং কোর্স করতে নাগপুরে যেতে পারেননি। প্রায় দুই বছর তিনি দক্ষতার সাথে ইউনিট পরিচালনা করেন।

বর্তমান বয়েজ ইউনিট পরিচালনা করছেন Prof. Bhupen Barman, Deptt, of Geography. An young and energetic ANO, 2019 এ Officer Training School, Kamptee, Nagpur থেকে Training করে Lieutenent Post লাভ করেন। নিয়মিত ক্লাস নেওয়া ও এডমিশনের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে যেভাবে তিনি ANO হিসাবে NCC Boys Unit পরিচালনা করছেন তাতে আগামীদিনে মহাবিদ্যলয়ের সুমান বৃদ্ধি করবেন এবং নিজের কর্মজীবনে অবশ্যই মেজর পদ লাভ করবেন। আশা রাখছি তার নেতৃত্বে আগামী ২০৩১ সালে বয়েজ ইউনিট Golden Jubilee Celebration মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে আর একটি স্বর্ণপালক যুক্ত হবে।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় এন.সি.সি.-এর ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আর একটি নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি হলেন Lt. Dr. Sulekha Pandit, Deptt. of Bengali. ১৯৯১ সালে NCC Girls' Unit-এর অনুমোদন পাওয়া যায়, 7 Bengal Girls Bn. NCC -এর অধীনে। Dr. Sulekha Pandit Company Commander হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং Officer Training করে Lieutenent Post লাভ করেন। ১৯৯১ থেকে ২০১৬ প্রায় ২৫ বছর তিনি দক্ষতার সাথে গার্লস ইউনিট পরিচালনা করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে অফিসারের দায়িত্ব পালন করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে এবং ক্যাডেটদের কাছে সুনাম অর্জন করেন। মহাবিদ্যালয়ে বয়েজ ইউনিটের -র Silver Jubilee Celebration Committee -এর দায়িত্বভার গ্রহণ করে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে তার অবদান অপরিসীম। এখনো তিনি সিনিয়ার প্রোফেসর হিসাবে বাংলা বিভাগে কাজ করে চলেছেন। আমরা তার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Lt. Dr. Sulekha Pandit মহাশয়ার অবসরের পর CTO হিসাবে দায়িত্ব পেলেন, Prof. Ankita Mukherjee, Deptt. of Bengali ২০১৬ থেকে ২০১৯ প্রায় তিন বছর তিনি দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে গার্লস ইউনিটের দায়িত্বে আছেন Prof. Sayoni Biswas, Deptt. of Sociology। ২০১৯

সালে তিনি Officer Training Course করে Lieutenent Post লাভ করেন। She is an youg and energetic officer for NCC. আগামীদিনে তার কর্মজীবনে অবশ্যই আরো সাফল্য আসবে এবং তিনি মহাবিদ্যালয়কে গৌরবান্বিত করবেন।

প্রতিবছর মহাবিদ্যালয়ের ক্যাডেটদের থেকে প্রায় ১০/১৫ জন -এর চাকরী হয় সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখায়। যেমন - BSF, CRPF, CISF, SSB, RPF, West Benal Police এবং Kolkata Police। নিয়োগের ক্ষেত্রে NCC B ও C Certificate -এর গুরুত্ব অসীম। ছাত্র-ছাত্রীরা এটা উলবব্ধি করতে পেরেছে বলেই এন.সি.সি.-তে ভর্তির প্রবণতা বহুগুণ বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও যেমন গুজরাট, দিল্লী, কেরালা, আসাম, বিহার -এর সেনা ছাউনিতে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পগুলিতে আমাদের ক্যাডেটরা অংশ নিয়ে থাকে। রিপাবলিক ডে প্যারেড, নিউ দিল্লী এবং কোলকাতাতে আমাদের অনেকেই অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে অমল সূত্রধর, সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, পরিতোষ কুমার দাস, মলিনা দাস (২০০৬)। মাননীয় রাজ্যপালের পদক লাভ করে। স্মরণীয় হয়ে থাকবে ১৯৯৫ সালে মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন ক্যাডেট Cycle Expedition from Cooch Behar to New Delhi via Kolkata তে অংশগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রপতি ভবন ভিজিট করার সুয়োগ পায়। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে তারা মহাবিদ্যালয়ের সুমান বৃদ্ধি করেছে।

পরিশেষে বলতে চাই, হে ক্যাডেট তোমরা আজ ভারত মাতার প্রহরী, স্বদেশের সীমানায় তোমাদের ভারি বুটের আওয়াজ, দেশ ও দেশমাতৃকা রক্ষার স্লোগানে ভীত কম্পিত হোক অশুভশক্তি। এগিয়ে চলো।

আমার চোখে জাতীয় সেবা প্রকল্প

স্বপন দে
এন.এস.এস. আধিকারিক
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় দেখতে দেখতে ৫০ বছরে পদার্পণ করল। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে লিখতে বসে আমার চোখে দেখা জাতীয় সেবা প্রকল্প সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগ করে নিতে চাই। ২০১১ সালে নভেম্বর মাসে আমাদের সকলের প্রিয় অধ্যাপক মাননীয় কিশোর কুমার চ্যাটার্জী মহাশয় অবসর নেওয়ার পর ২০১১ সালের ১লা ডিসেম্বর আমি তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের এন.এস.এস. আধিকারিক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রোগ্রাম অফিসারের ট্রেনিং সম্পূর্ণ করি। ২০১২ সালে কলেজে এন.এস.এস.–কে নতুন রূপে তুলে ধরবার চেষ্টা করি। ২০১২ সালের তুফানগঞ্জ ধলপলে এন.এস.এস.–এর ৫০ জন ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে শীতকালীন শিবির অনুষ্ঠিত করি। এরপর ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে তুফানগঞ্জ কলেজের ছাত্রী হিমানী দাস পাঞ্জাবে জাতীয় যুব দিবসে অংশগ্রহণ করে এন.এস.এস.–এর নাম উজ্জ্বল করে। ২০১৩ সালে তুফানগঞ্জ কলেজের স্বেচ্ছাসেবক সঞ্জীব সাহা ২৬শে জানুয়ারী দিল্লীর রাজপথে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। ২০১৪ সালে শোভা ঘোষ দিল্লীর রাজপথে প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। ২০১৫ সালে সন্তোষ শীল দিল্লীর প্যারেডে অংশগ্রহণ করে গোটা রাজ্যের মধ্যে নজির সৃষ্টি করে, কারণ এই তিন জনই ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়ে যায়। ২০১৬ সালে আমার নেতৃত্বে এন.এস.এস.–এর ১০ জন স্বেচ্ছাসেবক কলকাতার রেড রোডে মাননীয় রাজ্যপাল এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সামনে প্যারেড করার জন্য সুযোগ পেয়ে যায় এছাড়া ২০১৭ সালে এন.এস.এস.–এর স্বেচ্ছাসেবক শ্রী নিপু দাস কলকাতার রেড রোডে আর.ডি. প্যারেডে সুযোগ পান। ২০১৮ সালে আবারও আমার নেতৃত্বে তুফানগঞ্জ কলেজের ২ জন ছাত্র কলকাতার রেড রোডে প্যারেড করবার সুযোগ পান। ২০১৯ সালে এন.এস.এস.–এর স্বেচ্ছাসেবক শ্রী বিনয় দাস ও শ্রীমতি রিয়া সাহা দিল্লীতে ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করে। ২০২০ সালে তন্ময় সাহা জাতীয় যুব দিবসে অংশগ্রহণ করে। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এন.এস.এস. আধিকারিকরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে রাজ্য ও দেশের এন.এস.এস.–এর নাম তথা তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছেন। মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে লেখার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। এন.এস.এস.–এর দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে এন.এস.এস.–কে এক সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তারই ফলস্বরূপ হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৮ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাননীয় রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে বেস্ট প্রোগ্রাম অফিসার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। এছাড়া পরের বছরই ২০১৯ সালে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এন.এস.এস.–এর স্বেচ্ছাসেবক শ্রী বিনয় দাস বেস্ট ভলেন্টিয়ার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের এন.এস.এস.–এর স্বেচ্ছাসেবকরা সারা বছর ধরে নানা কর্মসূচী পালন করে থাকেন, যেমন – বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির, বিভিন্ন মুনীঋষিদের জন্ম জয়ন্তী পালন, এইডস্ দিবস পালন, স্বচ্ছতা অভিযান, বিভিন্ন সচেতন মূলক কর্মসূচী পালন করে থাকেন। আগামী দিনেও এন.এস.এস.–এর ছাত্র–ছাত্রীরা বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করবে এই প্রত্যাশা রেখে এখানেই শেষ করছি।

ব্রজদুলাল পাল মহাবিদ্যালয়ের প্রধান করণিক পদে যুক্ত থেকেছেন বহুদিন। ১০/১২/১৯৭১ থেকে ৩১/৮/২০১১ সুদীর্ঘ ৪০ বছর এবং অবসরের পরেও প্রায় ১১ বছর মহাবিদ্যালয়ের সাথেই ছিলেন। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের লেখাটি অসমাপ্ত রেখেই আকস্মিক ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রজত জয়ন্তী বর্ষের লেখাটি পুনর্মূদ্রণ করা হলো। মহাবিদ্যালয়ের গঠন পর্বের ইতিহাস এবং পরবর্তী পঁচিশ বছর পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে এতে।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পরিক্রমা

ব্রজদুলাল পাল

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পূর্ব প্রান্তদেশে আসাম ও বাংলাদেশ পরিবেষ্ঠিত কুচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা। তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই মহকুমার উচ্চতর শিক্ষার একমাত্র পীঠস্থান তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় রজত জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করতে চলেছে। পঁচিশ বছর পূর্বের চারাগাছ আজ বহু শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প পল্লবীত। মহকুমার আশা-আকাঙ্খার প্রতীক - মহাবিদ্যার এই পবিত্র পীঠস্থান বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের উত্তরাধিকার বয়ে নিয়ে যাবে বিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীতে। মহকুমার শিক্ষার ইতিহাসে অবতীর্ণ হবে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায়।

এই পবিত্র মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের কর্মজীবনের সাথে। কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সেদিনের ভূমিষ্ট শিশুটির ধীরে ধীরে যৌবনপ্রাপ্তি। এর প্রগতিময় প্রতিটি কর্মকান্ডের শরিক হতে পেরে আমি ধন্য। এর প্রতি গড়ে উঠেছে এক গভীর মমত্ববোধ। সেই আত্মিক টানে, রজত-জয়ন্তীর এই পড়ন্ত বেলায় আমার দীর্ঘদিনের নির্বাক সাথী এই মহাবিদ্যালয়ে ফেলে আসা দিনের বিশেষ মুহূর্তগুলি জীবনপঞ্জী করে তুলে ধরার প্রেরণা। কবে, কোন পটভূমিকায় এই মহীরূহের সুপ্তবীজ প্রোথিত হয়েছিল, যে ভ্রূণটি মাতৃজঠরে লালিত হয়েছিল, আর কিভাবেই বা ভূমিষ্ঠ হল তা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে এই শতকের ষাটের দশকের দোর-গোড়ায়।

১৯৫৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। স্কুল ফাইনালের পাশাপাশি চালু হয় উচ্চমাধ্যমিক কোর্স। এদিকে মহকুমায় ক্রমাগত ছাত্রবৃদ্ধির জন্য মহকুমায় বিদ্যমান নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল, বক্সিরহাট ও দেওচড়াই এই তিনটি হাইস্কুলের পক্ষে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অধিক সংখ্যক স্কুলের দরকার হয়। তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ঁধীরেন্দ্র নাথ বসু মহকুমার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে নতুন স্কুল খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একে একে ইলাদেবী গার্লস, বিবেকানন্দ, নেতাজী এবং গ্রামাঞ্চলে সিঙ্গিমারী, নাটাবাড়ী, মারুগঞ্জ প্রভৃতি হাইস্কুলগুলি গড়ে উঠল। তুফানগঞ্জ মহকুমা মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

মহকুমায় মাধ্যমিক স্তরে পড়াশুনার সুযোগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায়, ষাটের দশকের প্রথম ভাগ থেকে স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়তে থাকে। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যাও আশাতীত ভাবে বেড়ে যায়। কোচবিহার, দিনহাটা ও আলিপুরদুয়ার কলেজে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসনের অভাবে এবং স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়ে এই মহকুমার সাধারণ মানের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ঐ সকল কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। তাছাড়া অনগ্রসর কৃষিপ্রধান এই মহকুমার দরিদ্র পরিবারের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই দূরবর্তী ঐ কলেজগুলোতে অধ্যয়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠেনা ফলে প্রতি বছরই মহকুমার বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

এরূপ পরিস্থিতিতে মহকুমায় শিক্ষার অগ্রগতি ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি কলেজ স্থাপন করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৬৪ সনে তুফানগঞ্জের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ঁসর্বানন্দ সরকার (ট্যাপরা ধনী) এই মহকুমায় একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং নিজে ষাট হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। নানা কারণে সে প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না এবং প্রস্তাবটি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। বছর তিনেক বাদে আবার নতুন করে কলেজ তৈরীর উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৬৭ সনের ২৭শে এপ্রিল তদানীন্তন মহকুমা শাসক অমিয় কুমার মিত্রের আহ্বানে তুফানগঞ্জ টাউন হলে তুফানগঞ্জের গণ্যমান্য বক্তিদের একটি সভায় কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে ৫৪ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। ঁদীনেশ চন্দ্র দে সরকার ও ঁশঙ্কর সেন ঈশোর সহ সভাপতি, ঁধীরেন্দ্র নাথ নাথ বসু সম্পাদক, শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী যুগ সম্পাদক এবং ঁসুবোধ চন্দ্র পাল কোষাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সনের মে মাসের ১০ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ২১ সদস্য বিশিষ্ট কলেজ ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি পদে মহকুমা সহ-সভাপতি পদে ঁদীনেশ চন্দ্র দে সরকার ও ঁশঙ্কর সেন ঈশোর, সম্পাদক পদে ঁধীরেন্দ্র নাথ বসু, যুগ্ম সম্পাদক পদে শ্রী মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ঁসুবোধ চন্দ্র পাল নিয়োজিত হয়ে কলেজ গড়ার দায়িত্ব কাঁধে নেন। ঐ সভাতেই সাইট সিলেকশন সাব কমিটি এবং ফিনান্স সাব কমিটি ও সদস্যের পৃথক দুটি সাব-কমিটি তৈরী করে কলেজের স্থান নির্বাচন ও সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কমিটির কাজকর্ম শুরু করার জন্য সভাতে ৬০-০০ টাকা চাঁদা তুলে প্রাথমিক তহবিল গঠন করা হয়। স্টিয়ারিং এবং ওয়ার্কিং উভয় কমিটিতে আরও ৭ জন সদস্য নির্বাচন করা হয়।

কলেজ স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে কমিটির সামনে চারটি স্থানের প্রস্তাব আসে। প্রথম স্থানটি ন্যাশনাল হাইওয়ের ধারে বিবেকানন্দ স্কুলের পাশে, দ্বিতীয়টি রামহরি চৌপথির দক্ষিণে পুরানো শ্মশানের রাস্তার ধারে, তৃতীয়টি ঁকালিকিঙ্কর বাড়ির পশ্চিমে এবং চতুর্থটি চৌধুরী উইভিং ফ্যাক্টারীর উত্তরে। প্রথম দুটি স্থানের প্রস্তাবক কামাতফুলবাড়ী যুব সংঘ, তৃতীয়টির ঁকালিকিঙ্কর, চতুর্থটি ঁশ্রীশ চন্দ্র তালুকদার। সাইট সিলেকশন সাব কমিটি স্থানগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই কারণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান দুটি বাতিল হয়। তৃতীয় স্থানটির জমির মালিক কলেজের জন্য জমি বিক্রি করতে রাজি না হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায়। এ পর্যায়ে অন্দরাণফুলবাড়ি উত্তরায়ণ গোষ্ঠী কাছে তুফানগঞ্জ-ধলপল রাস্তার উপর কলেজের বর্তমান স্থানটির প্রস্তাব পেশ করে। সুদীর্ঘ সাত মাস ব্যাপী বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার পর ১৬-৪-৬৮ তারিখের সভায় অন্দরাণফুলবাড়ী উত্তরায়ণ গোষ্ঠী প্রস্তাবিত অন্দরাণফুলবাড়ীর বর্তমান স্থানটিকে কলেজ স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়। এবারে শুরু হয় জমি সংগ্রহের পালা। অন্দরাণফুলবাড়ী উত্তরায়ণ গোষ্ঠীকে জমি সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

কলেজের স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালেই চিন্তা ভাবনা শুরু হয় কোন ধরণের কলেজ তৈরীর প্রয়াস চালানো হবে। এরই মধ্যে মহকুমা শাসকের কাছ থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলের কৃষির উন্নতির জন্য কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস (বর্তমান লুথার্ন ওয়ার্ল্ড সার্ভিস) কিছু কাজ করতে চায়। অনগ্রসর কৃষিজীবিদের আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সচেতন করে তোলার জন্য তারা আগ্রহী। বিজ্ঞানের পাশাপাশি কৃষিবিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা থাকবে এমন কোন কলেজ তৈরী করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে, তাদের সংস্থা কলেজ ভবন ইত্যাদি তৈরী করে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের সদিচ্ছা বিবেচনা করে, তাদের সাথে আলোচনার পর ১৭/১২/৬৭ তারিখের সভায় আর্টস্, সায়েন্স ও এগ্রিকালচার এই তিনটি বিভাগে সমৃদ্ধ 'তুফানগঞ্জ কলেজ' গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কলেজ তৈরীর জন্য তহবিল গঠনের উদ্দেশ্যে নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস কলেজের জন্য কতটা সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে তা জরিপ করার অভিপ্রায়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এটা পরিস্কার হয়ে যায়, কলেজ স্থাপন পর্বটি দীর্ঘমেয়াদী। পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ২১/১২/৬৭ তারিখের সভায় ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ এই দুই বছরের জন্য মোট ২০ লক্ষ টাকা বাজেট তৈরী করা হয়। কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের সাহায্যের পরিমাণ আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা ধরে, অবশিষ্ট ৫ লক্ষ টাকা তুফানগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরিকল্পনা গ্রহর করা হয়। কলেজের নামে একটি পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। ডোনেশন আদায়ের জন্য মহকুমা শাসক অমিয় কুমার মিত্র বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি কলেজ কমিটির সদস্যদের নিয়ে তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাটের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন সময়ে বৈঠক করে ডোনেশন আদায়ের কাজকে ত্বরান্বিত করেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যাত্রা সাব-কমিটি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় প্রায় ৫৩ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। সামান্য কিছু জমি দানে পাওয়া গেলেও অধিকাংশ জমি উক্ত টাকায়

নগদে ক্রয় করে ৫২,৯৫৬.৮৪ টাকা মূলের ১৯.৮৬ একর জমি সংগ্রহ করা হয়।

জমি সংগ্রহের পাশাপাশি কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস যাতে কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করে তার প্রয়াস চালানো হয়। প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার পূর্বে কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস কলেজ স্থাপনের সরকারী অনুমোদন পাওয়া যাবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সরকারী বক্তব্যে জানা যায়, এগ্রিকালচার কলেজ তৈরী করার অনুমতি পাওয়া যাবে না, তবে একটি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ও তার সঙ্গে কৃষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট খোলার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে। সরকারী বক্তব্য জানার পর কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস এগ্রিকালচার উইং সহ কলেজের একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করে। ঠিক হয় প্রথম পর্বে এগ্রিকালচার উইংয়ের বিল্ডিংয়ের কাজ আরম্ভ করবে এবং পরবর্তীপর্বে এগ্রিকালচার উইংয়ের যে মেইন বিল্ডিং হবে তাতে কলেজের অন্যান্য বিভাগের ক্লাস হওয়ার উপযুক্ত কক্ষও থাকবে। প্রকল্প অনুযায়ী কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস প্রথম পর্বের কাজ শুরু করে। এবারে কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হয় এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিন ঠিক করা হয়। এর মধ্যে প্রকাশ পায়, কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস যে সমস্ত ভবনের কাজ শুরু করেছে তা এগ্রিকালচার ইস্টিটিউটের জন্য তৈরী হচ্ছে, কলেজের জন্য নয় এবং শুধুমাত্র কলেজের নামে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলে তারা তাতে অংশগ্রহণ করবে না এবং প্রকল্পটি পরিবর্তনের কথাও ভাববে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তড়িঘড়ি কলেজের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং 'তুফানগঞ্জ কলেজ ও ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার' নামকরণ করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৬শে মার্চ, বেলা ৪-০০ টায় কোচবিহার জেলা সমাহর্তা ভাস্কর ঘোষ তুফানগঞ্জ কলেজ ও ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাথে সাথে তুফানগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের আশা, তাদের সন্তান-সন্ততির উচ্চতর শিক্ষার পীঠস্থানটি গড়ে ওঠা সুনিশ্চিত হল।

পরবর্তীকালে মেইন বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু হলে দেখা গেল কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী বিল্ডিংয়ের রুমগুলি ছোট ছোট আকারে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং ঐ রুমগুলি কলেজের ক্লাস নেওয়ার উপযোগী হবে না। এ অবস্থায় পুনরায় কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল। আলোচনার শেষে বোঝা যায়, কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের বাড়িগুলি তৈরী হওয়ার পর সেখানে কৃষিবিভাগের অধীনে সরকারী নিয়ন্ত্রণে ফার্মার্স ট্রেনিং চালু করতে উৎসাহী। বাড়িগুলি কৃষি বিভাগকে দিয়ে দিয়ে বিনিময়ে তার হস্টেলের জন্য যে ভবনটির (বর্তমান প্রশাসনিক ভবন) নির্মাণ কাজ চলছে সেটি কলেজকে দিয়ে দেবে এবং কলেজের জন্য আরোও একটি দ্বিতল ভবন তৈরী করে দেবে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় কৃষি বিভাগও ঐ বাড়িগুলির দায়িত্ব নিয়ে সেখানে ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টার চালু করতে রাজী। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তুফানগঞ্জের সার্বিক উন্নয়ন বিশেষ করে এ অঞ্চলের কৃষকদের কথা বিবেচনা করে ২৯/১১/৭০ তারিখের সভায় কলেজের ২.৪৬ একর জমি সহ ওর উপর তৈরী হওয়া বাড়িগুলিকে ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টার চালু করার মহৎ উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগকে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং ৪/১২/৭০ তারিখের ১২১৯০ নং গিফট্ ডীডে তা হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। সেন্টারটি চালু হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেন্টারটি বন্ধ হয়ে যায়। ট্রেনিং সেন্টারের বিল্ডিংগুলি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে। পরবর্তী সময়ে মেইন বিল্ডিংয়ের রুমগুলিতে কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন অফিস চালু হয়। সেন্টারের স্টোর ইত্যাদি অন্যান্য অনেকগুলি বাড়ি আজও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। পরিত্যক্ত শূন্য ভবনগুলি রাতের অন্ধকারে অসামাজিক ক্রিয়াকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়। আজ ভাবলে শুধু দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভাবলে মনে হয়, তুফানগঞ্জবাসীর কষ্টের ধনে ক্রয় করা জমি ও তার উপর তৈরী বাড়িগুলি ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টার চালু করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিভাগকে দান না করাই শ্রেয় ছিল।

ফার্মার্স ট্রেনিং সেন্টারের দায় - দায়িত্ব কৃষি বিভাগের হাতে চলে যাওয়ায় কলেজের নাম তুফানগঞ্জ কলেজ ও ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচার অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ১০/২/৭১ তারিখের সভায় কলেজের নাম পরিবর্তন করে পুনরায় তুফানগঞ্জ কলেজ করা হয়। কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে উপস্থিত হওয়ায় ঐ তারিখের সভাতেই কলেজ চালু করার অনুমোদনের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কলেজ ওয়ার্কিং কমিটির উপর কলেজ গভর্নিংবডির দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ২৬/৩/৭১ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাদপ্তরের কাছে আবেদন জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ৪/৫/৭১ তারিখের সভায় কলেজ পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক দল ২৮/৬/৭১ তারিখে কলেজ পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শক দল তাদের রিপোর্টে তুফানগঞ্জ কলেজ চালু করার অনুকুল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে - এমন মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৮/৮/৭১ তারিখের সভায় কলেজ চালু করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে ৪৫,০০০ টাকার রিজার্ভ ফান্ড গঠন করে সরকারী অনুমোদন লাভের চেষ্টা করতে নির্দেশ দেন।

সরকারী অনুমোদন পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হওয়ায় কলেজ কমিটি ১৭/১১/৭১ তারিখের সভায় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজ চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় একজন অধ্যক্ষ, সাতজন অধ্যাপক, একজন লাইব্রেরিয়ান, একজন ক্লার্ক, দুইজন পিয়ন, একজন নাইটগার্ড, একজন সুইপার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য কলেজের প্রাথমিক কাজকর্ম চালানোর জন্য অবিলম্বে একজন লেকচারার-ইন-চার্জ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং অরুণ কুমার চক্রবর্তী উক্ত পদে যোগ দেন। এরই মধ্যে খবর পাওয়া যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় কলেজের অনুমোদনের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত রূপ পাবে। এ সংবাদে কলেজ কমিটির উৎসাহিত হয়ে ৮/১২/৭১ ইং তারিখের সভায় কলেজ উদ্বোধনের দিনক্ষণ স্থির করেন এবং উদ্বোধনের পূর্বেই কলেজটির অনুমোদন যাতে লাভ করা যায় তার জন্য লেকচারার-ইন-চার্জ অরুণ চক্রবর্তীকে কোলকাতায় পাঠান। ইতিমধ্যে প্রশাসকি কাজকর্ম চালানোর জন্য শিক্ষাকর্মী নিয়োগ পর্ব শুরু হয় এবং কলেজ উদ্বোধনের পূর্বেই নাইটগার্ড অনন্তলাল সরকার (৮-১২-৭১), করণিক পদে ব্রজদুলাল পাল (১০-১২-৭১), সুইপার পদে ঁবচিয়া বাঁসফোর (১০-১২-৭১) এবং পিয়ন পদে পুলেন্দ্র নাথ অধিকারী (১৩-১২-৭১) কলেজের কাজে যোগ দেন।

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭১ বেলা ১১-০০ টায় এক অনাড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুফানগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা সমাহর্তা বি.বি.শর্মা কলেজ উদ্বোধন করেন। কলেজ সম্পাদকঁ ধীরেন্দ্র নাথ বসু লিখিত ভাষণ পাঠ করে সমাপ্তি ভাষণে কলেজ সভাপতি মহকুমা শাসক সুধেন্দু সিরকার যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যে তিল তিল করে কলেজটি গড়ে উঠল তাঁদের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তুফানগঞ্জবাসীর ঐকান্তিক সহযোগিতায় ও কলেজ কমিটির নিরলস প্রচেষ্টায় মহকুমার একমাত্র উচ্চতর শিক্ষার পীঠস্থানটির প্রতিষ্ঠা হল। ডিগ্রি কলেজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে মহকুমার বুকে উচ্চতর শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হল এবং তুফানগঞ্জের জনগণের সুদীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল।

উদ্বোধনের দিনই যাতে কলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায় তার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালানো হয়েছিল। কিন্তু তা আর বাস্তবে সম্ভব হল না। উদ্বোধনের পরের দিন ২৪/১২/৭১ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর ২২৬৪ -ই,ডি,এন (সি, এস) নং আদেশনামায় তুফানগঞ্জ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেন। আর ১২/১/৭২ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৪৫/আর-৭২ নং আদেশনামায় ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষ থেকে তুফানগঞ্জ কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি ও বি.এ. ক্লাসে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃত এই সাতটি বিষয়ে পঠন-পাঠনের অনুমতি দিলেন। উদ্বোধনের পূর্বেই ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পর্ব সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনের শুভ লগ্নে অধ্যাপক সন্তোষ কুমার সাহা কাজে যোগ দেন। তারপর একে একে স্বপন কুমার রায়, স্মৃতিময় দে, নিভা সেন, অমর জ্যোতি মজুমদার, অভিজিৎ রায়, মঞ্জুরানী পাল (অস্থায়ী) প্রভৃতি অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শম্ভু চন্দ্র দাস কলেজে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে অস্থায়ী অধ্যাপিকা মঞ্জুরানী পালের স্থলে মনসিজ মোহন সরকার এবং অধ্যাপক স্বপন কুমার রায় চলে যাওয়ায় সেই শূণ্য পদে অমল কুমার চক্রবর্তী যোগদান করেন। প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসের ৪৮ জন এবং বি.এ. ক্লাসে ৩৮ জন, সর্বমোট ৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ৫ই জানুয়ারী ১৯৭২ কলেজের পঠন-পাঠনের যাত্রা শুরু হল।

৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ লেকচারার ইন চার্জ অরুণ কুমার চক্রবর্তী হঠাৎ কলেজে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ চলে যান। বরিষ্ঠ অধ্যাপক সন্তোষ কুমার সাহার কাঁধে লেকচারার-ইন চার্জের দায়িত্বভার এসে পড়ে। অতঃপর ১৯৭২ সনের ১৫ই মে, ডঃ পবিত্র গুপ্ত প্রথম অধ্যক্ষ রূপে সদ্যোজাত কলেজটির পরিচর্যার দায়িত্বভার মাথায় তুলে নেন। কলেজের বীজ বপনের মুহূর্ত থেকে ডঃ গুপ্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করার দিন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় কলেজ সম্পাদকঁ ধীরেন্দ্র নাথ বসু অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। একাজে এন.এন.এন. হাইস্কুলের অফিস স্টাফরা, বিশেষ করে ঁনীতিশ চন্দ্র পাল ও শচীন্দ্র কুমার সাহা নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করেন। কলেজ কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং তুফানগঞ্জের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় তিল তিল করে কলেজটি গড়ে উঠেছে, তাঁদের অবদানের কথা কলেজের ইতিহাস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৭২ সনের ২রা জুলাই কলেজের প্রথম ব্যাচ প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় বসে। সে সময়ে সারারাজ্য জুড়ে পরীক্ষায় অসুস্থ গণ টোকাটুকির যুগ। তুফানগঞ্জ কলেজের পরীক্ষায় যাতে তার প্রভাব না পড়ে এবং যাতে এক নির্মল পরিবেশ রচনা করে পরীক্ষা পরিচালনা করা যায় তার জন্য অধ্যক্ষ গুপ্তের নেতৃত্বে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীগণ তৎপর হন। শুরু হয় প্রস্তুতি। সক্রিয় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন কলেজ কমিটির সদস্যগণ, বিশেষ করেঁধীরেন্দ্র নাথ বসু, ঁদীনেশ চন্দ্র দে সরকার, শৈলেন্দ্র নাথ রায় মৌলিক, জীবন দে, মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক সুধেন্দু সিরকার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পরীক্ষায় শুরুতেই পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে বই-খাতা-নোট ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে

এবং হল ছেড়ে বেরিয়ে আসে। উপস্থিত সবাই পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুস্থ পরিবেশে পরীক্ষা দিতে রাজী করান। অবশেষে এক সুন্দর বিশুদ্ধ পরিবেশে নির্বিঘ্নে সেদিনের এবং পরবর্তী বাকি দিনগুলির পরীক্ষাপর্ব সমাপ্ত হয়। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দৃঢ়তায় এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতায় প্রারম্ভিক লগ্নে কলেজে পরীক্ষা পরিচালনায় যে সুন্দর পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, আজ পঁচিশ বছর বাদেও তা অক্ষুন্ন রয়েছে।

১৯৭২ এর নভেম্বর নাগাদ কলেজ তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কলেজের দৈনন্দিন খরচ ও স্টাফের বেতন মেটানো অসম্ভব হয়ে যায়। শুরু হয় নতুন করে ডোনেশন তোলার অভিযান। কিন্তু তাতে বিশেষ সাড়া মেলেনা। পরিশেষে কলেজ কমিটির কতিপয় সদস্য ও শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মাসিক চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তাঁদের মাসিক দানে স্টাফদের বেতনের সংস্থান হয়। ১৯৭৩ সনের প্রথম ভাগে কলেজের তহবিল পুষ্ট করার অভিপ্রায়ে কলেজের নামে লটারী খেলা পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১১/৮/৭৩ তারিখ লটারী খেলার সরকারী অনুমোদনও পাওয়া যায়। কিন্তু লটারীতে বিশেষ সুবিধা হয় না। একের পর এক তারিখ পিছোতে পিছোতে অবশেষে ৯/২/৭৫ তারিখে লটারীটি অনুষ্ঠিত হয় এবং যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক লাভ হয়।

তুফানগঞ্জ কলেজের ইতিহাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সিমেন্ট আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কলেজের বিল্ডিং হস্তান্তর করার সময় কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিস বেশ কিছু সিমেন্ট বর্তমান প্রশাসনিক ভবনের নীচের তলার রুমগুলিতে তালাবন্ধ করে রেখে যায়। দীর্ঘদিন তারা ঐগুলির খোজ খবর করে না। বছর দুয়েক বাদে ১৯৭৪ সনের এপ্রিল মাসে কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের কতিপয় ব্যক্তি মাঝে মাঝে দু একটা রুম খুলে তার ভিতরের সিমেন্টগুলি নিয়ে যেতে থাকে। ছাত্রদের মনে সিমেন্টের মালিকানা সম্পর্কে সন্দেহ দানা বাধে। খবর দিয়ে জানতে পারে, সিমেন্টগুলি কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের স্টক রেজিস্টার বহির্ভুত। তারা কলেজের জন্য সিমেন্টগুলি আটকে রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ২০/৪/৭৪ রুমগুলোতে তালার উপর তালা লাগিয়ে দেয়। ছাত্ররা চাবিগুলি কলেজ কমিটির হাতে তুলে দিতে চায়, কিন্তু কলেজ কমিটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এতে ছাত্ররা রুষ্ট হয় এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করে। দেবেন্দ্র নাথ বর্মা, সুশীল মোদক, অশোক রায়, অম্বিকা দাস, উজ্জ্বলা দে, অঞ্জলি ব্যানার্জী, অঞ্জলি সাহারায় প্রমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক দুর্বার ছাত্র আন্দোলন। এই আন্দোলনে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ অসহায় ছাত্রদের পাশে দাঁড়ায়। ডঃ পবিত্র গুপ্ত ও অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে ছাত্রদের উৎসাহ দেন। কোচবিহার রিফিউজি সার্ভিসের এজেন্ট সিমেন্ট ফিরে পাওয়ার জন্য ডি.এম. -এর সাহায্য প্রার্থী হন। ডি.এম - মহকুমা শাসক ও পুলিশকে সিমেন্ট বের করে নেওয়ার নির্দেশ দেন। শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব। ১/১০/৭৪ তারিখে পুলিশ কলেজে প্রবেশ করতে চাইলে অধ্যক্ষ অনুমতি দেন নি। উত্তেজিতছাত্র-ছাত্রীরা পুলিশের প্রতি বিক্ষোভ শুরু করে। শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ছোড়া। কলেজের সম্মুখভাগ এক রণক্ষেত্রের রূপ নেয়, কলেজের ছাত্রদের পাশে শহরের অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররাও এসে দাঁড়ায়, সৃষ্টি হল এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসন অধ্যক্ষের সাহায্য চাইতে বাধ্য হল। শুরু হল আলোচনা বৈঠক (২-১০-৭৪ এবং ৩-১০-৭৪)। পরিশেষে প্রশাসন রণে ভঙ্গ দিল। ছাত্র আন্দোলন জয়ী হল। এরপর শুরু হল সিমেন্ট বিক্রি পর্ব। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের তদারকিতে সিমেন্ট বিক্রি সম্পন্ন হল। সিমেন্ট বিক্রির সময় ব্যাগ পিছু কলেজ ডেভেলপমেন্টের জন্য চাঁদাও সংগৃহীত হল পূজার ছুটির পরে বিজায়ানুষ্ঠান করে কলেজের উন্নতিকল্পে ছাত্ররা অধ্যক্ষ ডঃ পবিত্র গুপ্তের হাতে সিমেন্ট বিক্রির ৩৭৮০০ টাকা এবং কলেজ ডেভেলপমেন্টের জন্য তোলা ১২,০৬০ টাকার চেক তুলে দেয়। কলেজের তলবিলে এই ৪৯৮৬০ টাকা জমা পড়ায় কলেজের আর্থিক সংকট অনেকাংশে দূরীভূত হল।

১৯৭৪ সনের শেষভাগ থেকে সিমেন্টের টাকায় একগুচ্ছ উন্নতিমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। বিশ হাজার টাকা ফিক্সড্ ডিপোজিট করে তৈরী হল স্টুডেন্টস্ ওয়েলফেয়ার ফান্ড। উক্ত ফান্ড থেকে কলেজের দুঃস্থ অসুস্থ ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা হয়ে থাকে। পরিশোধ করা হল দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা বইয়ের দেনার টাকা। কেনা হল টাইপ রাইটার, ডুপ্লিকেটর, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র এবং খেলার মাঠের জন্য ১.৪০ একর জমি। আরও ১.০০ এক জমি রেজিষ্ট্রি বাকী থাকল, শুধুমাত্র সংলগ্ন জমির ভাগিদার মালিকেরা সকলে একত্রে উপস্থিত না হওয়ার কারণে। প্রশাসনিক ভবনের দোতলা অফিস, লাইব্রেরী ও স্টাফ রুমের স্পেস বাড়ানো হল। কলেজ ও স্টাফ কোয়ার্টার্সে বৈদ্যুতিকরণ হল। প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি করা হল। একে একে অসিত কুমার রায়, অজয় কুমার সাহা, শ্যামাপদ দত্ত, আলাউদ্দিন আহমেদ ও জয়ন্ত কুমার গোস্বামী এই ছয়জন অধ্যাপক ১৯৭৫ -এর ফেব্রুয়ারী কলেজে যোগ দিলেন। ইংরেজীর শিক্ষক পদটি উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে শূন্য পড়ে রইল। অফিসের কাজের সুবিধার জন্য বর্তমান ক্লার্ক পদটিকে হেডক্লার্ক পদে রূপান্তরিত করে একটি ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদ সৃষ্টি করা হল। ব্রজদুলাল পাল হেডক্লার্ক পদে এবং পুলেন্দ্র নাথ অধিকারী ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে প্রমোশন পেলেন। শূন্য

পিয়ন পদ ও লাইব্রেরীয়ান পদে বিমলেন্দু সাহা ও দিলীপ কুমার দে নিয়োগ হলেন।

৪র্থ পরিকল্পনায় কলেজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কারো থেকেই কোন ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট পায়নি। অবশ্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় সরকারী অনুমোদনে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, ৪র্থ পরিকল্পনায় কলেজ কোন প্রকার সরকারী ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট পাবে না। মঞ্জুরী কমিশনের গ্র্যান্ট পেতে হলে নিয়মানুযায়ী কলেজকে ২ (এফ) সেকশনে মঞ্জুরী কমিশনের তালিকাভুক্ত হতে হয়। তাই শুরু হল নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া। তৈরী করা হল কলেজের মেমোরান্ডাম। মেমোরান্ডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করল এবং মেমোরান্ডাম অনুযায়ী ১০-৭-৭৫ তারিখ থেকে কলেজের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে 'তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়' নাম লাভ করল। রেজিস্ট্রেশন সোসাইটি অ্যাক্টে ১০/১১/৭৫ তারিখ তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের নাম রেজিষ্ট্রি হল। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের ৩/১/৭৭ তারিখের এফ, ৮-৬৮/৭৬ (সি.পি.) নং আদেশ নামায় তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ২ (এফ) সেকশনে মঞ্জুরী কমিশনের তালিকাভুক্ত হল। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেসিক এবং ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল। পঞ্চম পরিকল্পনার গ্র্যান্টের জন্য প্রস্তাব তৈরী করে মঞ্জুরী কমিশনের কাছে পাঠানো হল।

দিলীপ কুমার দে লাইব্রেরীর কাজে যোগ দেওয়ার আগে পুলেন্দ্র নাথ অধিকারী আংশিক সময়ের জন্য লাইব্রেরীর বই লেন-দেনের কাজ করেন। তিনি কাজে যোগ দেওয়ার পর আগোছাল লাইব্রেরীকে সাজানো শুরু হয়। কোন লাইব্রেরীয়ান না থাকায় একাজে শিক্ষকদের একাংশ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলেন। অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী, অভিজিৎ রায়, অসিত কুমার রায়, অমল কুমার চক্রবর্তী প্রমুখ শিক্ষকগণ অবসর সময়ে নিয়মিত লাইব্রেরী পুনর্গঠনের কাজ করতে লাগলেন। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বুক গ্র্যান্টে কিস্তিতে কিস্তিতে আসতে শুরু করায় দফায় দফায় আরও অনেক মূল্যবান বই কিনে লাইব্রেরী সমৃদ্ধ করা হল। এতদিন বাকীতে যে বইগুলো কেনা হয়েছিল তার দামও পরিশোধ করা হল। শিক্ষকেরা ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরী ব্যবহার করতে উৎসাহী করে তোলেন। রিডিং রুমে নিয়মিত পড়াশুনা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেল। অধ্যক্ষ পবিত্র গুপ্ত শিক্ষকদের সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরী ব্যবহারের যে পরিবেশ তৈরী করেছিলেন, আজও সে ধারা বর্তমান।

লাইব্রেরী প্রসারণের পাশাপাশি একে পরিপূর্ণ করে তোলার অভিপ্রায়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জীবন, জীবিকা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শনে সমৃদ্ধ একটি মিউজিয়াম গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হল। সংগ্রহ করা হল রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের বাদ্যযন্ত্র, শিকারের সরঞ্জাম, মাছ ধরার সরঞ্জাম, শোলার কাজ, মাটির কাজ, কৃষিকাজের সরঞ্জাম, অলংকার ইত্যাদির বেশ কিছু নিদর্শন। ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ এক বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হল। তপশীলি জাতি ও উপজাতির ছাত্র -ছাত্রীরা মূল্যবান নিদর্শনগুলি সংরক্ষণের জন্য একটি কাঁচে ঢাকা শো কেস দান করল। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবে পরবর্তীকালে মিউজিয়ামের বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। পুরানো হায়ার সেকেন্ডারী এবং প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের অবলুপ্তি ঘটিয়ে চালু হয় (১০+২) হায়ার সেকেন্ডারী, ২ বছরের ডিগ্রি পাশ এবং ৩ বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স। ফলে ঐ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজের প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স উঠে গেল এবং পরিবর্তে হায়ার সেকেন্ডারী কাউন্সিলের অনুমতিতে নতুন (১০+২) হায়ার সেকেন্ডারী কোর্স চালু করা হল। পুথিগত বিদ্যা শেখার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সমাজ সেবা ও জন কল্যাণকর কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারে, সে জন্য উদ্যোগ নেওয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিতে ১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষে চালু হল জাতীয় সেবা প্রকল্প। অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে এন.এস.এস. চালাতে লাগলেন।

১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে অধ্যাপক অসিত কুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে চালু হল বয়েজ এন.সি.সি. কোর্স। এদিকে ক্রমাগত ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকায় অনার্স ও বি.কম. পাশ কোর্স খোলার দাবী উঠতে লাগল। কলেজ কমিটি একযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষাদপ্তরের কাছে আবেদন পাঠাল। তদ্বির করতে করতে অনেক দিন পার হয়ে গেল। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শক দল কলেজ পরিদর্শন করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিবাচক সুপারিশ শিক্ষাদপ্তরে পৌছাল। পরিশেষে দীর্ঘ চার বছরের প্রচেষ্টার ফলে শিক্ষা দপ্তরের ২৪/৬/৮১ তারিখের ১১৫২- ই.ডি.এন. (সি.এস.) নং চিঠিতে ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনার্স এবং বি.কম. পাশ কোর্স চালু করার অনুমতি পাওয়া গেল। শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার মুখে অনুমতি মেলায় ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষ থেকে কোর্সগুলির পঠন-পাঠন শুরু করা হল। ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বেই ৩/৮/৮১ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিও এসে গেল। এরপর পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে ইংরেজীর শূণ্যপদ

এবং কমার্সের দুটি পদে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল পরিশেষে ১৯৮২ -এর ফেব্রুয়ারীতে ইংরেজী পদে ধর্মদাস ব্যানার্জী ও কমার্সের একটি পদে হরিগোপাল মল্লিক এবং এপ্রিলে কমার্সের অপর পদে কিশোর কুমার চ্যাটার্জী যোগ দিলেন।

১৯৭৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্য সরকার পে-প্যাকেট স্কীম চালু করে কলেজ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পুরো বেতনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এতে কলেজের আর্থিক অনটন কমতে থাকল। অল্পকাল বাদেই ছাত্র বেতনের ৭৫ ভাগ টাকার সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার পরেও স্বাভাবিক খরচ খরচা বাদে প্রতি বছর কিছু কিছু অর্থ কলেজ ফান্ডে জমতে থাকে। এছাড়া কোয়ার্টার্স মেন্টেনেন্স, কলেজ ডেভেলপমেন্ট এবং লাইব্রেরী ডেভেলপমেন্ট ফান্ডেও বেশ কিছু টাকা জমে। শুরু হল দ্বিতীয় পর্বে কলেজ উন্নয়ন কর্মসূচী। অধ্যাপক শ্যামাপদ দত্ত ও অমল কুমার চক্রবর্তীর তদারকিতে ১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮১-৮২ এই তিন বছরে ধাপে ধাপে কোয়ার্টার্স সংস্কার, কোয়ার্টার্সের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ, কলেজ বিল্ডিংয়ের দরজা-জানালা মেরামত, অফিস লাইব্রেরী ও স্টাফরুমের স্পেস বাড়ানো, অফিস, লাইব্রেরী ও স্টাফরুমের ফার্ণিচার এবং ক্লাশের জন্য বেঞ্চ ও ডায়াস তৈরী ইত্যাদি কাজগুলো সম্পন্ন হয়। ১৯৭৯-৮০ সনে তপশিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে মেয়েদের হোস্টেল বিল্ডিং গ্র্যান্ট বাবদ ৮৯০০০ টাকা পাওয়া গেল। রাজ্য পূর্তদপ্তরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ার অশোক কুমার পালের পরামর্শে ও সহযোগিতায় এবং অধ্যাপক শ্যামাপদ দত্ত ও অমল কুমার চক্রবর্তীর তদারকিতে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলতে লাগল। ছাদের উচ্চতা পর্যন্ত দেওয়াল ইত্যাদি তৈরী হতেই টাকা ফুরিয়ে যাওয়ায় মাঝ পথে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের কাছে টাকার জন্য বারবার আবেদন নিবেদন করেও কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল না। নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত পড়ে রইল। ১৯৭৮ সনে রাজ্য সরকার কলেজ কর্মচারীদের স্টাফ প্যাটার্ন চালু করে। স্টার্ফ প্যাটার্ণ অনুসারে কলেজের অফিসের জন্য ১ জন একাউন্ট্যান্ট, ১ জন ক্যাশিয়ার, ১ জন ক্লার্ক, ১ জন পিয়ন, ১ জন দারোয়ান এবং লাইব্রেরীর জন্য ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন লাইব্রেরী ক্লার্ক ইত্যাদি মোট সাতটি নতুন পোষ্ট পাওনা হয়। ১৯৮১ সনে পোষ্টগুলির অনুমোদন আসার পর পুলেন্দ্র নাথ অধিকারীকে অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে, বিমলেন্দু সাহাকে ক্যাশিয়ার পদে এবং দিলীপ কুমার দে কে লাইব্রেরীয়ান পদে ১/৭/৮১ তারিখে প্রমোশন দেওয়া হয়। এরই মাঝে বিমলেন্দু সাহা কলেজের চাকরী ছেলে চলে যান। এরপর শূণ্যপদ গুলিতে প্রথামাফিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮২ সনের জুলাই মাসে ক্যাশিয়ার পদে কুনাল দাস, ক্লার্ক - টাইপিস্ট পদে মৃগাঙ্ক কুমার প্রামাণিক, ক্লার্ক পদে প্রথমে পুলক সেনগুপ্ত এবং তার পদত্যাগের পর বিশ্বজিৎ তালুকদার (১৫/৩/৮৩), পিয়ন পদে চরিত্র দেবনাথ ও ঝর্ণা বর্মা, দারোয়ান পদে জ্যোতিশ চন্দ্র দাস, লাইব্রেরী ক্লার্ক পদে প্রথমে মনোতোষ কুমার সাহা এবং তার পদত্যাগের পর গণেশ চন্দ্র বর্মা এবং লাইব্রেরী পিয়ন পদে কুন্তলা অধিকারী যোগ দেন। পরবর্তীকালে বাঁশফোড়ের মৃত্যুর পর সুইপারের শূণ্যপদে ছোটেলাল বাঁশফোড় নিয়োগ হন (১/৮/৮৬)। ১৯৭৮ সনের স্টাফ প্যাটার্ণ অনুযায়ী ২৫০-৭৫০ সংখ্যার ভিত্তিতে অনুমোদিত ১৪টি নন টিচিং পোষ্ট আজও বর্তমান। নতুন স্টাফ প্যাটার্ণ অনুসারে প্রাপ্য অতিরিক্ত কর্মী সংখ্যার অনুমোদন আজও পাওয়া যায়নি। ফলে কাজের ভারে প্রতিটি কর্মী হাবু ডুবু খাচ্ছে। দিনের পর দিন অসমাপ্ত কাজের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

অধ্যক্ষ পবিত্র কুমার গুপ্ত বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হয়ে ১৯৮২ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর কলেজের দায়িত্বভার পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের দশটি বছর এই মহাবিদ্যালয়ে কাটিয়ে যান। এখানে যোগ দিয়ে এক ঝাঁক তরুণ তরতাজা সহকর্মী নিয়ে মেতে ওঠেন সদ্যোজাত এই কলেজটির পরিচর্যায়। কর্মচঞ্চল, উদ্যোমী এই মানুষটি সহকর্মীদের অনুপ্রাণিত করে গড়ে তোলেন এক টীম-স্পিরিট। সৃষ্টি হয় শিক্ষার এক অপূর্ব পরিমন্ডল। কলেজ অফিসে গড়ে ওঠে প্রচলিত ধারা বহির্ভূত এক অনবদ্য ওয়ার্ক কালচার, যেখানে ছিল না কাজের কোন ধরা বাধা সময়, ছিল না তথাকথিত কোন অফিসিয়াল আদব-কায়দা। রসিকজনেরা রঙ্গ করে বলতেন পবিত্র বাবুর নো-সিস্টেম অফিস। সেই নো-সিস্টেমের পথ বেয়েই গড়ে ওঠে মহাবিদ্যালয়ের কাজের ধারা। আর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পৌঁছে যায় অভীষ্ট লক্ষে, অর্জন করে উত্তরবঙ্গের কলেজগুলোর মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা।

ডঃ গুপ্ত চলে যাওয়ার পর প্রায় দশ বছর কলেজ অধ্যক্ষহীন থাকে। মাঝে শুধু এক বছরের জন্য ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায় অধ্যক্ষ পদে কাজ করে যান। অধ্যক্ষবিহীন এই দীর্ঘ সময়ে লেকচারার ইন চার্জগণ কলেজ পরিচালনা করেন। ১/১০/৯২ তারিখে অধ্যপক সন্তোষ কুমার সাহা ডঃ গুপ্তের হাত থেকে লেকচারার ইন চার্জের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রায় দু বছর দায়িত্ব পালন করেন। এই দু বছরের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষক পদ সরকারী অনুমোদন লাভ করে। তৃতীয় পদে অধ্যাপক অমল মন্ডল ২২/৫/৮৪ তারিখে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার বেসিক ও ডেভেলপমেন্টের গ্র্যান্টের প্রস্তাবগুচ্ছ অনুমোদিত হয় এবং প্রথম কিস্তির বুকগ্র্যান্টের টাকা চলে আসে। একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালক সমিতির ২১/৭/৮৪ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে তুফানগঞ্জ পৌরসভাকে ০.১৭ একর

জমি দান করা হয়। বিজ্ঞান ও বাংলা অনার্স কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪/৯/৮৪ তারিখে ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায় অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। কিন্তু এক বছর বাদে তিনি ইস্তফা দিয়ে চলে যান। তিনি বিজ্ঞান ও বাংলা অনার্স কোর্স চালু করতে তৎপর হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ২/৫/৮৫ তারিখ শিক্ষা দপ্তরের এবং ২৪/৭/৮৫ তারিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক দল কলেজ পরিদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন রিপোর্টে ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে বি.এস.সি. পাশ কোর্স ও বাংলা অনার্স কোর্স চালু করার সুপারিশ করা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান পড়ানোর নুন্যতম পরিকাঠামো তৈরী করার ব্যয় সরকার বহন করতে রাজী না থাকায় তখনকার মত প্রস্তাবটি চাপা পড়ে।

ডাঃ রায় ইস্তাফা দেওয়ায় অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী ১৪/৯/৮৫ থেকে লেকচারার ইন চার্জের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় সাড়ে ছয় বছর কৃতিত্বের সাথে কলেজ পরিচালনা করেন। তাঁর প্রশাসনিক কালের প্রথম দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অসিত কুমার রায় কলেজ ছেড়ে চলে যান (২/১/৮৬)। সেই শূণ্যপদে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় পদে অধ্যাপক সুলতান লাল রহমান (১৯/৩/৮৬) এবং অধ্যাপক আব্দুল কাদের সফিলি (১৯/৬/৮৬) যোগ দেন। প্রশাসনিক কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় তিনি এন.এস.এস. প্রোগ্রাম অফিসারের দায়িত্ব ১/৮/৮৬ থেকে অধ্যাপক অজয় কুমার সাহার কাঁধে তুলে দেন। আর অধ্যাপক হরিগোপাল মল্লিক ২৩/৯/৮৬ এন.সি.সি. অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে অসিত রায়ের স্থলাভিষিক্ত হন। ৬/৭/৮৬ অধ্যাপক অগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী চলে যান। সেই শূণ্যপদে অধ্যাপিকা সুলেখা পন্ডিত যোগ দেন (১০/৪/৮৯)। এ সময়ে সমাজ বিদ্যা বিষয়টি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাশ কোর্সে বিষয়টি চালু করার সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেলেও, শিক্ষক পদ মঞ্জুর না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগের পর ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে কোর্সটি চালু করার অনুমতি দেয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষক পদ অনুমোদিত হয় এবং অধ্যাপক বিজয় বিহারী সোম উক্ত পদে যোগ দেন (৩/১১/৮৯)। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে মহিলা এন.সি.সি. চালু হয় এবং অধ্যাপিকা সুলেখা পন্ডিত এন.সি.সি. অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কলেজে বিজ্ঞান পড়াশোনার পরিকাঠামো তৈরী করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৭ম পরিকল্পনার গ্র্যান্টের প্রকল্পসূচী তৈরী করা হয়। প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হওয়ার পর মঞ্জুরী কমিশন ও রাজ্য সরকারের ম্যাচিং গ্র্যান্টের সাহায্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বই, ৮০ হাজার টাকার ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি এবং ১২ হাজার টাকার টি.ভি. সেট ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া জিলা পরিষদের ৪ হাজার টাকায় দুটি জলের ট্যাঙ্ক এবং কলেজ ফান্ড পৌরসভা ও জিলা পরিষদের টাকায় সাইকেল শেড্ এবং বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৯১-৯২ সনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৮ম পরিকল্পনার গ্র্যান্টের প্রস্তাবগুচ্ছেও অনুমোদন লাভ করে। দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ায় অধ্যাপক অজয় কুমার সাহা (৫/২/৯২) তারিখে উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ছয় মাস বাদে বর্তমান অধ্যক্ষ যোগ দিলে তিনি দায়িত্বমুক্ত হন।

১৯৯২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। কাজে যোগ দিয়েই তিনি সুদীর্ঘ দশ বছর অধ্যক্ষবিহীন থাকা কলেজটির দ্রুত উন্নয়নের প্রয়াস নেন। শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও পরিচালকমন্ডলীর সমর্থন ও সহযোগিতায় সফল হন প্রতিটি পদক্ষেপে। নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয় বিজ্ঞানের পাশ কোর্স। কম্পিউটার কোর্স চালু হয় ইনস্টিটিউট অব কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া)-র যৌথ সহযোগিতায়। ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে চালু হয় বাংলা ও সমাজবিদ্যার অনার্স কোর্স এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রকল্পে রিমীডঅ্যাল কোচিং। ১৯৯৬-৯৭ বর্ষে শুরু হল ইতিহাসের অনার্স কোর্স। তিনি কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তী (১৫-৯-৯২) এবং কিছু সময় বাদে অধ্যাপক অভিজিৎ রায় (৯-১-৯৫) কলেজ ছেড়ে চলে যান।

সায়েন্স ল্যাবরেটরী নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে যোগাযোগ শুরু করেন বিভিন্ন দপ্তরের সাথে। তুফানগঞ্জবাসীকে সামিল করেন কলেজের উন্নয়ন কর্মসূচীতে। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এগিয়ে আসে সাহায্যের ডালি নিয়ে। সেই অর্থে শুরু হয় ল্যাবরেটরী ফার্ণিচার নির্মাণের কাজ, ক্রয় করা হয় কিছু যন্ত্রপাতি, কলেজ ফান্ডের টাকায় বিজ্ঞান ভবনের বৈদ্যুতিকরণ, আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকায় ল্যাবরেটরী টেবিল, গ্যাস প্ল্যান্ট এবং গ্যাস ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা, শিক্ষা দপ্তরের ১ লক্ষ টাকায় যন্ত্রপাতি ক্রয়, কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্টের ১.৫০ লক্ষ টাকায় গ্যাস প্ল্যান্টের চেম্বার ও স্টোর নির্মাণ ইত্যাকিজগুলি করে বিজ্ঞান ভবনকে সাজানো হয়। জিলা পরিষদের ২৫ হাজার টাকায় প্রশাসনিক ভবনে জল সরবরাহ ব্যবস্থা, শিক্ষা দপ্তরের ৭৫ হাজার টাকায় ভবন মেরামত ও চুনকাম-রঙ করে কলেজকে সাজানো হয়। ইউ.জি.সি -র অষ্টম পরিকল্পনার প্রথম কিস্তির টাকায় বই ও জেরক্স মেশিন কিনে লাইব্রেরীকে সাজানো হয়। এছাড়া অসমাপ্ত গার্লস হোস্টেল, প্রশাসনিক ভবন সম্প্রসারণের জন্য এম.পি. কোটার ২ লক্ষ টাকা, বিজ্ঞান ভবনের দোতলা নির্মাণের জন্য

আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের প্রথম কিস্তির ২ লক্ষ টাকায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজগুলি খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মসূচীর এই জোয়ারে কলেজ জোর-কদমে এগিয়ে যাবে ভবিষ্যতের পথে।

৮৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যে কলেজটির যাত্রা শুরু, আজ সে পরিপূর্ণ যৌবনে উদ্ভাসিত, ১১৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর কলকাকলিতে মুখরিত। পঁচিশ বছরে শত শত ছাত্র-ছাত্রী এসেছে এর আঙিনায়, পেয়েছে শিক্ষার আলো, সফল হয়েছে জীবনযুদ্ধে। রজত জয়ন্তী বর্ষের অন্তিমলগ্নে সে দীপ্যমান হয়ে অঙ্গীকার করছে ভবিষ্য-প্রজন্মকে জ্ঞানালোকে সম্পৃক্ত করার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় অফিস রেকর্ড।

সেই প্রাজ্ঞ মহীরূহ কথা

কমলেশ সরকার (বঙ্গরত্ন)
প্রাক্তন ছাত্র

আর একবার দেখে নিই সে জীবন
যে ছায়ায় বসে জীবন এঁকেছি,
প্রতিদিনের কথকতার অনন্ত দিনলিপি
আজ যখন মনে পড়ছে চারপাশে
অনেক কথার ভীড় চেনা মুখ
অচেনা সব ছবি অনেক জিজ্ঞাসাচিহ্ন আঁকা
আজ যখন মনে পড়ছে ...
আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখছি
অসংখ্য জোড়া জোড়া চোখ
ক্যানভাসে ছবিতে অমসৃণ কাটাকুটি
উদাসী হাওয়ায় ডানা মেলে উৎসুখ
সব পাখিরা মুক্ত চিন্তা মনে
বে আব্রু লতার দোল দোল খেলা
আজ আর একবার সেই সব খলকথা
আবারও বলছি মাঠে গিয়ে মাটের হাওয়ায়
গায়ে মাখবো দুহাতে জড়াবো সুখ
সেই সব বল্গাহীন শব্দেরা ঘরে ফিরেই
আসে রঙীন স্বপ্ন উড়ান দিনগুলি
কবিতা কথায় গদ্যে পদ্যে লিখছি
এক জীবন সনাতন স্বপ্ন আঁকতে বসেছি
ফের একবার জীবন আঁকতে আঁকতে
কবিতা লিখতে লিখতে
সেই প্রাজ্ঞ মহীরূহ কথা।
না বলা কথার ভীড় চারপাশে
নীল আঁকা বিন্যস্ত নীলিমার কাছে
নতজানু সততই সে, মনে পড়ে,
দুবেলা সে মিলন মাটের গল্প
সে মন্দিরের ছায়া পড়তো অনেক নিচে
মাটিতে তারই তলে বসে নত ও বিনীত
সঙ্গীরা কে কোথায় গেছে উলাহারি
জীবন আঁকছে হয়তোবা ... এত এত কথা
বিচিত্র সব জীবন আঁকা আর শিরোনাম লেখা
ছায়া মায়া কথা মনে পড়ছে
মাঠ পেরিয়ে পথ পেরিয়ে দূরে গিয়ে
দিগন্তে মিশে যাওয়া
আজ কত কথাই মনে পড়ছে
স্বপ্ন ও ঘুমের মধ্যে যে কারও মুখ
লিখতে বসে সে কারও মুখ
স্বপ্নে ভেসে যাওয়া
এক জীবন কথা
আমরা যে পথের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম
তারপর অন্যপথ অন্য এক পথের দিশা
আমরা যে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম
সেই জীবন নদীর গল্প
চলো জীবন গল্প বলি
আর একবার সেই প্রাজ্ঞ মহীরূহ কথা।

অবসর

চরিত্র দেবনাথ
প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

এখন সঙ্গী শুধু
বাজারের থলি আর রেশনের ঝোলা,
বিশ্রামাগারে সময় যাপন,
বন্ধুদের সাথে দীর্ঘ আলাপন,
সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে নিঃসঙ্গ ব্যথা।

মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা –
কর্মজীবন, সহকর্মীদের সাথে
এক যোগে কাঁধে কাঁধ রেখে দায়িত্ব পালন।
নন্দ, অপু, তারিনী, অন্য সবাইকে ঘিরে।

আজ মনে পড়ে শৈশবে বাবা মায়ের স্নেহ,
কত দুষ্টুমি, মান-অভিমান, স্নেহ ও আদর।
ভেবেছি করব অনেক কিছু
স্বপ্ন রেখেছি মনে, কিন্তু হায়!
মিলায় বেলা, এখন দূরের তারা – তারাময় দেশে,
সাধ্যাতীত সব কিছু।

সবাজ সেবা!
সমাজ বদলে গেছে সেবকের ভিড়ে
আমি কোণঠাসা।

এখন সঙ্গী শুধু বাজারের থলি
আর রেশনের ঝোলা,
আর নিঃসঙ্গ আমি
নিয়ে অজস্র স্মৃতির মেলা।।

বাঁচিয়ে তোলা বিষ

তুহিন সান্যাল
বিভাগীয় প্রধান ইংরেজী বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

রক্ত যেমন জমাট বাঁধে, তেমন বাঁধিস
চুল,
জমুক সেথায় তোর-আমার ওই নিস্ব
করা ভুল।

চলার পথের পাথরগুলো কুড়িয়ে নিয়ে
যাই,
শেষ বেলার ওই ওজন যত, রাখব যে
আলগা-ই।

বুম্বাগড়ের রাজাও জানি আমার থেকে
ভালো,
সুকুমারের সু-কুমারীর জামাই সে
জমকালো।

কালকে যখন ভোরের বেলায় সূর্য্যি
বলবে, "ওঠ"!
আমার চুমো-য় ভিজিয়ে নিবি রাত
কাবারের ঠোঁট।

রাত-কাবারের গল্প অনেক, অনেক যে
তার গান,
বুম্বাগড়ের চুল-চেরা তুই দুহিতা
আখ্যান।

তর্কে তোকে হারিয়ে দিয়েও হারবো
অহর্নিশ,
মিষ্টি আমি তিতকুটে, তুই বাঁচিয়ে
তোলা বিষ।

আমার দ্বাদশ

সুভাষ দাস (প্রাক্তন ছাত্র)

সময়টা ১৯৯২। সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি। মনের ইচ্ছে ছিল কোন রকমে মাধ্যমিক পাশ করলেই স্বপ্ন পূরণের কথা ভাববো। আমার স্বপ্ন খুব অবাস্তব ছিল না। ইচ্ছে ছিল ট্রাক ড্রাইভার হবো। জাতীয় সড়কের পাশে হামেশাই দেখতাম দূর পাল্লার ট্রাক দাড়িয়ে পড়েছে। পথের পাশেই একটু জায়গা করে নিয়ে ওরা রান্না করছে, খাওয়া দাওয়া করছে, গান শুনছে আবার পাড়ি জমাচ্ছে। ওদের দেখতাম আর মনে মনে ভাবতাম ওরাই ভালো আছে। খাচ্ছে দাচ্ছে, গাড়ি চালাচ্ছে আর এক রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেন জানিনা এই ঘুরে বেড়ানোটা আমার ভালো লাগতো। আর আমার অবস্থা হিসেবে এটাই ছিল আমার ইচ্ছে পূরণের সহজ উপায়।

কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণ আর হল না। যার গাড়িতে উঠে যাত্রা শুরু করব ভেবেছিলাম সে তখন ভিন রাজ্যে। ফিরতে মাস খানেক দেরি হবে। তাই ভাবলাম মাধ্যমিক তো পাশ করলাম, অগত্যা এবার পরের ভর্তির ফর্মটা জমা করি। ঠিক করলাম উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে পড়বো। তখন কলেজেও এইচ.এস. পড়ানো হতো। ভাবলাম কলেজে পড়লে হয়তো ক্লাসের চাপ কম থাকবে, আর তাতে আমার সুবিধাই হবে। অবশ্য একবার ভেবেছিলাম আমার স্কুল অর্থাৎ এন.এন.এম. হাই স্কুলে কমার্স নিয়ে ভর্তি হবো, কিন্তু তা সম্ভব হল না একটা ছোট্ট কারণে। ফর্মে সই করানোর জন্য হেড মাষ্টার মহাশয়ের (শিবদাস বোস স্যার) ঘরে ঢুকেছি এবং সোজা হয়ে দাঁড়াইনি বলে উনি আমার বাঁ গালে ডান হাতে সজোরে চড় মারলেন। কান্না পেলেও কাঁদতে পারলাম না। উপরন্তু উনি জানিয়ে দিলেন আমার কমার্স পড়া হবে না। অগত্যা কলেজে পড়ার পথটাই খোলা রইলো। ভর্তি হলাম। কাউকে চিনিনা। দুএক জনের সঙ্গে কথা হলেও স্কুলের থেকে একটু অন্যরকম লাগছিল। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই ক্লাসের শিক্ষক মহাশয়দের কিছু কথা আমার মানসিকতায় পরিবর্তন আনলো। ভালো লাগতে লাগলো পড়াশোনার জগত। মাসখানেকের মধ্যেই তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় হয়ে উঠলো আমার কলেজ।

বুঝতে পারলাম জীবনে সময় নষ্ট করে ফেললে আর পরিশ্রম করেও কোনো লাভ নেই। জীবনে ভালো থাকার জন্য পড়াশোনার বিকল্প কিছু হয়না। কয়েকজন ভালো বন্ধুও পেলাম। দীপেন দত্ত, শঙ্করী সাহা, অজিত রায়, বাণী, ভবানী আরো কয়েকজন যাদের মধ্যে দীপেন ও বাণী ছাড়া কারো সঙ্গে বিগত ১৫ বছর কোনো দেখা সাক্ষাৎ কথা নেই। জানিনা ওরা কে কেন আছে, কোথায় আছে। খুব ইচ্ছে হয় বন্ধুদের দেখবার।

কলেজের প্রথম দিনেই আমার একটা প্রাথমিক ধারণা বদলে গিয়েছিল। শুনেছিলাম কলেজে নাকি ক্লাস না করলেও চলে। কথাটা হয়তো ঠিকই যে, কলেজে ক্লাস না করলেও হয়, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কয়েজে ক্লাস হয়। আমরা যারা ক্লাস করতে চাইলাম তারা নিয়মিত ক্লাস করলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করতে থাকলাম ক্লাসের ঘর, মাঠের ঘাস আর বইয়ের লাইব্রেরী।

কলেজের নিয়ম অনুসারে কিছু কিছু ক্লাস দুপুরের পরে থাকত। কেন জানি না অল্প কিছুদিনের মধেই একটা ক্লাসের নেশায় পেয়ে বসল আমাকে এবং আমার মতো অনেককেই। একটা ক্লাসের জন্যও বসে থাকতে শুরু করলাম দুপুর গড়ানো বিকেল পর্যন্ত। ১১ নম্বর ঘর ভরা থাকতে শুরু করলো দিনভর। অনুভব করলাম অধ্যাপনার আন্তরিকতা। কেবল পাঠ্য বিষয় নয়, বই এবং বইয়ের বাইরের জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে আমরা অকাতরে শিক্ষকদের সঙ্গে একটা অদৃশ্য ভালোলাগার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম। আর সেই সূত্রেই এখনো অবসরে কিংবা কখনো ঘুম না এলে অথবা অকারণ ভাবলে সেই দুটো বছর চিরভাস্বর চিরসবুজ মনে হয়। সেই দুটো বছর জীবনের এমন কিছু জানার, চেনার, পাওয়ার এবং বোঝার বছর ছিল যা অনেকের মতোই আমার জীবনকেও নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল।

আর এই ভাবতে শেখা যাঁদের কথায় তাঁরা আমার ঈশ্বর, আমার শিক্ষক। সেই সময়ের পঠন-পাঠন জনিত আনুগত্য আজও আমায় নতুন করে ভাবতে শেখায়। আর কলেজের শিক্ষকদের কথা বলতে গেলে সবার আগে সবার পরে বলেও কিছু থাকে না। আমি যদি আমার ক্লাসের শিক্ষকদের নিয়ে দু-এক কথায় কিছু বলতে চাই তবে তাও সম্ভব নয়। কেননা প্রতিদিনের শেখায় পড়ায় এত কথা আছে যা বলে শেষ হবে না। তবু স্মৃতির পাতা থেকে একসাথে অনেক কথা ভেসে এলেও এক এক করে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করে।

মনে পড়ছে এস.পি. (অধ্যাপক সুলেখা পন্ডিত) ম্যাডামের কথা। ওনার কথাটা প্রথমেই মনে এল, কেননা যতদূর মনে আছে কলেজের প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস ওনার ছিল। তাই সেদিনের সেই প্রথম স্মৃতি ভুলতে পারিনি। মনে আছে ক্লাসে

'আরণ্যক' পড়িয়েছিলেন ম্যাডাম। ক্লাসে সব সময় সিরিয়াস দেখেছি তাঁকে। বইয়ের প্রতিটি লাইন ধরেই পড়িয়েছেন তিনি আমাদের। প্রতিটি শব্দ ধরে। প্রথমে একটু অসুবিধা হলেও পরে তার সুফল ভোগ করেছিলাম আমরা। আর তাই একসময় আমরা তাঁর ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। এর পর তাঁকে আমরা কেবল একজন শিক্ষক নন, একজন মরমী মানুষ হিসেবেও আবিষ্কার করলাম। মনে পড়ছে প্রথম টেস্ট পরীক্ষার পর তিনি একদিন ক্লাসে এসে কয়েকটি নাম ধরে ডাকলেন। তার মধ্যে আমার নামটাও আছে শুনে প্রথমটায় একটু অবাক হলাম, কিঞ্চিত দুশ্চিন্তাতেও পড়লাম, পরে বুঝলাম বাংলায় যারা একটু ভালো লিখেছিল তাদের নিয়ে তিনি একটা অনুষ্ঠান করবেন আকাশবাণীর শিলিগুড়ি সেন্টারে। বিষয় বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'। স্থির হলো দীপেন, শঙ্করী আর আমি তাঁর সঙ্গে শিলিগুড়ি যাবো। থাকার ব্যবস্থা হবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ম্যাডামই সব ঠিক করেছেন। ম্যাডাম আর শঙ্করী থাকবেন গার্লস হোস্টেলে, আমি আর দীপেন থাকবো বয়েজ হোস্টেলে, আমাদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র প্রদীপ দা'র ঘরে। সব শুনে মনের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ তৈরী হল। আকাশবাণীতে অনুষ্ঠানে তো অংশ নেবই সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে পাব। প্রসঙ্গত প্রদীপ দা'র কথাও একটু বলতে ইচ্ছে করছে। প্রদীপ দা মানে শ্রী প্রদীপ সাহা, পরবর্তীতে দিনহাটা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। এই প্রদীপ দা'র ঘরে গিয়েই আমার প্রথম ইউনিভার্সিটি দেখা। ডাইনিং টেবিলে বসে সবার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা। প্রথম লেবুর গন্ধ যুক্ত সাবানে হাত মুখ ধোয়া। প্রদীপ দা'র কথা বললাম ঠিকই কিন্তু বলতে গিয়ে মনটা খুব খারাপও হচ্ছে, কেননা সেই প্রদীপদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।

যাই হোক সেদিন ম্যাডামের সঙ্গে আকাশবাণীতে 'আরণ্যক' -এর আলোচনা খুব ভালো হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে শুনেছিলাম তার সম্প্রচার। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা ম্যাডাম যেভাবে আমাদের পড়িয়েছেন, ভাবতে শিখিয়েছেন তা আমার কাছে চিরকালীন সম্পদ, আমার পথের পাথেয়।

এস.কে.এস. (অধ্যাপক সন্তোষ কুমার সাহা) স্যারও ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় স্যার। স্যারকে কখনো মন খারাপ করা বা গম্ভীর মুখে দেখিনি। সবসময় হাসির মেজাজে থাকতে ভালোবাসতেন। যেন হাসতে হাসতেই ক্লাসে ঢুকতেন। বইয়ের পড়া বই ধরে খুব বেশি হত না, কিন্তু সহজ করে, গল্প করে পড়া এগোত। প্রতিদিনই ক্লাসের সময় ভাবতাম আজ কিছু অন্যরকম কথা, মন ভালো করার কথা শুনতে পাবো। আর সত্যি সত্যি প্রতিদিনই সেই হাসিতে উচ্ছ্বলতায় আমরা নির্বাক তাঁর ক্লাস করতাম। ভালো লাগছে সেই ভালো লাগার দিনের কথাগুলো মনে করতে, ভালো লাগছে এই ভেবে যে, হাসির আবহেও পড়াশোনা হয়েছিল একদিন, একত্র একসাথে হেসেছিলাম আমরা সবাই।

এস.পি.ডি. (অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ দত্ত) স্যারের কথাও মনে পড়ছে। স্যার আমাদের ফিলসফির লজিক পড়াতেন। আবার পড়তে পড়তেই জীবনের ওঠাপড়া, ভালোমন্দ সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে এতো গভীর কথা বলতেন যে, আমরা অভিভূত হয়ে পড়তাম। স্যারকে দেখতাম সবসময় স্পষ্ট করে কথা বলতেন, কম কথা বলতেন এবং সমস্ত কথার পেছনে একটা যুক্তি থাকতো। তিনি ছাত্রদের ঠিক বুঝিয়ে উঠতে না পারলে কষ্টও পেতেন। মনে পড়ছে তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন 'এই ছেলেটিকে দেখে মনে হচ্ছে ও একটু চেষ্টা করলে পারবে। সেদিন স্যার এই কথাটা আর পাঁচটা সাধারণ কথার মতো বলে ফেললেও আমার খুব ভালো লেগেছি এবং আজও স্পষ্ট মনে আছে আমি সেদিন ক্লাসরুমে বেঞ্চের ঠিক কোন জায়গায় বসেছিলাম। পড়ন্ত বিকেলের সেই স্মৃতি আজও আমার মনকে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়। ভাবি ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের একটা সাধারণ কথাও কত মূল্যবাণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, তৈরী করে দিতে পারে আত্মবিশ্বাস।

এস.পি.ডি. ছাড়া আমাদের ফিলসফি পড়াতেন এ.জে.এম. (অধ্যাপক অমরজ্যোতি মজুমদার) স্যার। তাঁর সঙ্গে আমাদের একটু দূরত্ব থাকলেও আমরা তাঁর ক্লাস করতাম। তিনি আমাদের ভারতীয় দর্শন পড়াতেন। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হলেও পরের দিকে তাঁর কাছে ভারতীয় দর্শন পড়তে খুব ভালো লাগতো।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের এ.এম. (অধ্যাপক অমল মন্ডল) স্যার ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। ক্লাসে তিনি যা পড়াতে শুরু করতেন আমরা সে বিষয়ে তৈরী হলাম কিনা সেটা তিনি সবসময় খেলায় রাখতেন। তাই তাঁর ক্লাসে আমরা সর্বদা সজাগ থাকতাম। এছাড়া এ কে.এস. (অধ্যাপক আব্দুল কাদের সাফেলি) স্যারকেও আমরা দেখেছি যে তিনি তাঁর বক্তব্যকে সকলের কাছে পৌছে দিতে চাইতেন। একটা টান টান উত্তেজনা আমরা তাঁর ক্লাসে অনুভব করেছি। এই বিভাগের এস.এস.এল. (অধ্যাপক সুলতান লাল রহমান) স্যারও সকলকে ভালবেসে পড়াতে ভালোবাসতেন। অল্প সময়ে অনেক কথা আমাদের শোনাতেন। একটা মোহ তৈরী হতো আমাদের।

মনে পড়ছে ইতিহাসের এ.আর. (অধ্যাপক অভিজিৎ রায়) স্যারের কথা। এখনো মনে আছে তার মুখে পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ। স্যারকে দেখতাম সবসময় একটু গুছিয়ে কথা বলতেন, সহজ করে ইতিহাসের গল্প বলতেন, অদ্ভুত মুগ্ধতায়

ভরে থাকত ক্লাসঘর। এই বিভাগের এ.এ. (অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ) স্যারের ক্লাসও আমরা করেছি, উনি একটু দ্রুত কথা বলতেন, একটু আরাম করে পড়াতে ভালোবাসতেন।

ইকনমিক্সের এস.ডি. (অধ্যাপক স্মৃতিময় দে) স্যারও গুছিয়ে বলতে ভালোবাসতেন। অর্থনীতির বিষয়কে আমাদের সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তিনি সবসময়ই করতেন। জে.জি. (অধ্যাপক জয়ন্ত গোস্বামী) স্যারও অর্থনীতি পড়াতেন, সবসময় বসে পড়াতেন একটু সময় নিয়ে পড়াতেন, তাঁর ক্লাসও আমাদের উপভোগ্য ছিল।

ইংরেজীর এ.সি. (অধ্যাপক অমল চক্রবর্তী) স্যার অল্প কথায় সহজ করে কোনো কিছু বোঝাতে ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের কবিতা পড়াতেন এবং সবার সঙ্গে একটু সহজ করে ভাব বিনিময় করতে চাইতেন। মনে পড়ছে একদিন তাঁর কথায় মাঠের গরু তাড়িয়েছিলাম। আবার ইংরাজীতে গল্প পড়াতেন ডি.বি. (অধ্যাপক ধর্মদাস ব্যানার্জী) স্যার। আমাদের বোঝানোর জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন। এছাড়া তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. হাই স্কুলের ততকালীন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবদাস বোস স্যারও আমাদের কিছুদিন ইংরেজী পড়িয়েছেন। ভালো লেগেছে তাঁর ক্লাস। স্মৃতিতে প্রাঞ্জল আজও তাই।

এছাড়া মনে পড়ছে একটু গম্ভীর প্রকৃতির বি.এস. স্যারের কথা। তবে বিষয় হিসেবে আমার সোসিয়োলজি না থাকায় ওনার ক্লাস করিনি। কিন্তু স্যারকে ভালো লাগতো। এস.ডি. (অধ্যাপক সন্তোষ দেবনাথ) স্যারকেও মনে পড়ছে। সবসময় হেসে কথা বলতেন, ভালো লাগতো আমাদের।

আরো দুজন স্যারকে খুব মনে আছে, কে.সি. (অধ্যাপক কিশোর চ্যাটার্জী) স্যারকে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জন্য আমরা সকলে জানতাম। স্যার কমার্সের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর ক্লাস করতে না পারলেও নাটক দেখার সুযোগ হয়েছে। এছাড়া ডি.এম. (অধ্যাপক দেবাশীষ মিত্র) স্যার। উনি বিজ্ঞানের, কলেজের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম দেখা, আমদের একটা ক্যুইজের অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে কথা য়, সেই থেকে তাঁকে চিনি। স্যারের কথা বলা কিংবা তাঁর নিজস্বতা আমাদের খুব ভালো লাগতো।

লাইব্রেরীয়ান দিলীপ দা (শ্রী দিলীপ দে) আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন। রিডিং রুমের পড়াশুনা করার পরিবেশও আমরা পেয়েছি। তিনি নিজেও পড়াশোনা করতে ভালোবাসতেন। আমাদের ক্লাসেও তিনি কয়েকদিন পড়িয়েছেন। মনে আছে রবীন্দ্রনাথেদ্দর 'শাস্তি' গল্প পড়িয়েছিলেন। গণেশ দা (শ্রী গণেশ চন্দ্র বর্মা) একটু কম কথা বলতেন, কিন্তু লাইব্রেরীতে সবসময় তার সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এছাড়া ঝর্ণা দি আর কুন্তলা দিকেও আমরা পেয়েছি যারা আমাদের ভালোবাসতেন এবং দরকার হলে শাসন করতেন।

অফিসের সঙ্গে আমাদের খুব বেশি যোগাযোগ ছিল না। থাকার কথাও নয়। তবু যেটুকু ছিল তাতে সবসময় তাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি। মনে আছে কুণাল দা'র (শ্রী কুণাল বোস) কথা। একটু হেসে কথা বলতেন, গম্ভীর থাকতে ভালোবাসতেন। মৃগাঙ্ক দা'ও (শ্রী মৃগাঙ্ক প্রামাণিক) আমাদের সঙ্গে অবসরে গল্প করতেন, ভালো লাগতো। বিশ্বজিৎ দার (শ্রী বিশ্বজিৎ তালুকদার) হাতের লেখা আমার খুব ভালো লাগতো। ব্রজ দা'র (শ্রী ব্রজদুলাল পাল) সঙ্গে খুব বেশি কথা হতা না, তবে খেলোয়াড় হিসেবে বিশেষ করে ফুটবলের জন্য আমরা ওনার ভক্ত ছিলাম। পুলীন দা (শ্রী পুলীন অধিকারী) একটু কম কথা বলতেন, সবসময় কিছু একটা ভাবছেন এমনটা মনে হত। এছাড়া চরিত্র দাও আমাদের খুব ভালোবাসতেন, সবসময় হেসে কথা বলতেন।

মনে পড়ছে বি.সি. (অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী) স্যারের কথা। তিনি এই সময়তেই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি। অনেক সময়ই রসায়নের বিষয় নিয়ে গল্প করতেন। তিনিও অকাতরে ছাত্রদের ভালোবাসতেন। আমার নিজেরই একটা এরকম ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে। তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রতিদিনই দুই বেলা করে হতো। একটা বাড়তি চাপ থাকত। আমাদের পরীক্ষা হচ্ছে এম.এন.এম. হাইস্কুলে। হঠাৎ পরীক্ষা দিনে বেরোনোর সময় এডমিট কার্ড খুঁজে পাচ্ছি না। হাতে খোঁজার মতো সময়ও নেই। আমার পাশের বাড়িতেই পড়াশোনার জন্য থাকত করিম দা (বাড়ি ছিল চর বালাভূত)। তাকে বললাম যে, একটু কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপাল স্যারকে সমস্যার কথাটা জানাতে। করিম দা কলেজে গেলো, আমি ঢুকলাম পরীক্ষার হলে। একটু পরেই সেলিম দা এসে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে গেল। বিপ্লব স্যার আমার সমস্যার কথা শুনে, আমার যাবতীয় তথ্য দিয়ে যাতে পরীক্ষায় বসতে পারি সেই মমেল একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এটা দেখে একদিকে আমার যেমন চিন্তা দূর হল তেমনি মনটা আনন্দে ভরে গেলো। আরো একটা ঘটনার কথা বলতে ইচ্ছে করছে। আমি আর আমার এক বন্ধু প্রলয় (এন.এন.এম. হাই স্কুলের বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রী প্রলয় ভাদুড়ী) একদিন বিকেলের দিকে মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আমাদের কথায় কথায় উঠে এলো যে, একেবারে একজন মানুষের জীবন ভাবনা কেমন তা কীভাবে জানা যাবে। উত্তর হিসেবে উঠে এলো, এর জন্য সাধারণ হতে হবে। কিন্তু

কিভাবে তা হবে? ঠিক হলো আমরা একজন এমন সাধারণ মানুষ হিসেবে সবার সামনে উপস্থিত হবে যা ভাব বিনিময়ের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। ঠিক করলাম আমরা বাউল হয়ে বেরিয়ে পড়বো পথে ঘাটে গ্রামে গ্রামে। আমাদের মনের কথা স্যারকে জানালাম। ভাবলাম ওনার থেকে একটা লিখিত অনুমতিপত্র পেলে আমাদের সুবিধা হবে। এই পরিকল্পনার কথা শুনে প্রিন্সিপাল স্যার প্রথমটায় খানিকটা চিন্তায় পড়লেও পরে তাতে সম্মতি জানালেন। এই সময় তিনি বিজ্ঞানের এমন কিছু পরীক্ষার কথাও আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে কাজে লাগিয়ে কিছু চালাক মানুষ অন্যকে বোকা বানিয়ে সুবিধা আদায় করে। স্যার বললেন সেই সব কথাও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে, যা কুসংস্কার কিংবা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা তাতে উৎসাহিত হলাম। অবশেষে বাউল হয়ে ঘোরা হল বেশ কিছু গ্রাম শহর। প্রায় এক মাস পর ফিরে এসে আমাদের যাত্রা কলেজের অফিসের সামনেই শেষ করলাম। শোনালাম আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন অন্য কেউ আমাদের কী ভেবেছিল জানিনা, স্যার কিন্তু আমাদের ভালোই বলেছিলেন। আর তারই ফলস্বরূপ পরবর্তীতে আমরা আরো খানিকটা বেশি সময়ের জন্য একইভাবে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম।

বস্তুত এই কলেজ থেকেই আমরা শিখেছিলাম যে জীবনে সময়, সামর্থ্য আর অর্থ কখনো একসাথে পাওয়া যায় না। ছাত্রদের অর্থ না থাকলেও সময় ও সামর্থ্য আছে। আর এই দুইকে নষ্ট না করে কাজে লাগাতে পারলে জীবনে কখনো হেরে যেতে পারে না। বুঝতে শিখেছিলাম যে, প্রজাপতির সৌন্দর্য ফুলে ফুলে ফুটে ওঠে ঠিকই কিন্তু তার স্থায়িত্ব ফুল যতক্ষণ ঠিক ততক্ষণ। ঝড় হলে, বৃষ্টি হলে যেমন ফুল ঝরে যায় তেমনি প্রজাপতিও হারিয়ে যায়। অথচ প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে যে মেঘের উপরে ওড়ে সেতো ঈগল, সুদূর পথের যাত্রী। আমরা এই কলেজের ক্লাস থেকেই জেনেছিলাম ঝঞ্ঝা এড়িয়ে সুদূরে মেঘের উপরে যেতে হলে কেবল প্রজাপতির ঋণিক সৌন্দর্যে আটকে থাকলে হবে না। সময় ও সামর্থের উপযুক্ত ব্যবহারই ছাত্রকূলের সঠিক পথ। সেখানে কেবল ঘাসের ফুলে ফুলে মাঠে মাঠে প্রজাপতির আবহ রচনা করলে চলবে না, ঈগলের মতো উপরে ওড়ার স্বপ্ন দেখতে হবে, যেন মেঘের ওপরে, যেখানে ঝড়ের কবলে দিশা হারাবার অবকাশ নাই।

শুধু তাই নয়, এই কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্যুইজ - বিতর্ক - তাৎক্ষণিক বক্তব্য - আবৃত্তি - সঙ্গীত - নৃত্য - প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পাশাপাশি সেমিনার, খেলাধূলা, এন.এস.এস., এন.সি.সি. ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা প্রাণবন্ত রূপ ছিল। সুলেখা ম্যাডামের কণ্ঠে 'কর্ণ কুন্তি সংবাদ', অভিজিত স্যারের আবৃত্তি 'এক গাঁয়ে', কিশোর স্যার নাটক, অমল স্যারের বক্তৃতা কিংবা আমাদের উৎসাহে ভালোবেসে অংশ নেওয়া প্রতিযোগিতার স্মৃতি আজও অফুরান ও অনাবিল আনন্দের উৎস। আমি কলেজ থেকে এইচ. এস. পাশ করে ১৯৯৪ তে বাংলা সাম্মানিক নিয়ে এ.বি.এন.শীল কলেজে ভর্তি হলাম। এরপরের বছর অর্থাৎ ১৯৯৫ সাল থেকে এই কলেজে বাংলা অনার্স পাঠক্রম শুরু হল এবং এই খবর শুনে মনটা একটু খরাপই হয়েছিল, পড়তে পারলাম না ভেবে। এই সময়তেই ছিলো কলেজের ২৫ তম বর্ষের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন, সদ্য প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিলাম সেই উদ্‌যাপন বর্ষের বিবিধ কার্যক্রম। সেবছর কলেজের সেই উৎসব হয়ে উঠেছিল যেন তুফানগঞ্জের শিক্ষারও মহোৎসব। সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্প-বিজ্ঞান এক মাঠে মিলেমিশে - মেতেছিল। আমাদের মহাবিদ্যালয় আরো ২৫ বছর অতিক্রম করেছে। তবে বর্ষ হিসেবে সুবর্ণ জয়ন্তী সেই মতো হবার নয়, সঙ্গত কারণেই করোনা মহামারি জনিত সময়ে তার পথ খোল নেই। তবু মনের তো বাঁধন থাকে না, তাই তার ঐতিহ্যকে মহত্তের দরবারে পৌঁছে দেবার ইচ্ছে থেকে আমরা যেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানের নিরিখে কলেজকে অগ্রসর হতে দেখতে পারি, মুখরিত হতে পারি তাকে ঘিরে এই আশা। আর আমরা জানি ইচ্ছে থাকলেই ভালো থাকা ভালো রাখা দুই-ই হয় সাথে সাথে। আর সেই আমার এবং আমাদের সকলের স্বপ্নের পাঠশালার ইতিবাচক বৃত্ত থেকেই এখনো মনে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মহাবিদ্যালয়ের স্বরূপ ঐতিহ্য এখনো উজ্জ্বল, এখনো সে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে স্বতন্ত্র। আর যদি তা মলিন হয়ে থাকে তবে তার প্রতিকার চাই, আর সকলের মতো আমিও এই শিক্ষা নিকেতনের উজ্জ্বল মুখ চাই। আদর্শ আরাধনার অবকাশ তৈরী হলে দূর থেকে দেখে গর্বিত আনন্দে তার ফেরিওয়ালা হতে চাই। আর তাই
বলতে ইচ্ছে হয় -

ঘরের নাম্বার বদলায় না / বদলে যায় নাম,
সোচ্চারে বলবো তবু / আমিও ছিলাম।
বলবো শুধু / ভালো থাকুক
উরুক রঙিন ডানায়, / তারই সাথে
স্বপ্ন ফিরুক / মেঘের পরের হাওয়ায়।

মা তুঝে সালাম

বিশ্বজিৎ তালুকদার
হেডক্লার্ক, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

হ্যাঁ, আজকের লেখা আমার মাকে নিয়েই। আমার দুটো মা – একজন হলো আমার গর্ভধারিনী মা, যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করে এই সুন্দর পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। আর এক মা যিনি আমার অন্নদাত্রী, আমাকে সমাজের বুকে পরিচিতির ছোঁয়া লাগিয়ে দেবার কাজটা করে দিয়েছেন – তিনি হচ্ছেন তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। যার কাছ থেকে পাঠ নিয়ে তাঁর অনেক সন্তান সন্ততি এই দেশের এই বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমার মাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

১৯৭১ সালে ২৩শে ডিসেম্বর তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের জন্ম যার বয়স এই ২০২১ সালে পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে যাকে আমরা বলি সুবর্ণ জয়ন্তী। অনেক সংগ্রাম, অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় আজকের এক বলিষ্ঠ জায়গায় দাড়িয়ে। ১২ (বারো) টা বিষয়ে অনার্স এবং বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ নিয়ে মোট ১৭টা বিষয়ে প্রোগ্রাম কোর্স। পাশাপাশি চলছে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (মাস্টার্স) ডিগ্রী অর্জন ও প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েশন করবার জন্য নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। দুটো খেলার মাঠ। বালক, বালিকাদের জন্য পৃথক এন.সি.সি. ইউনিট। দুটো এন.এস.এস. ইউনিট। একটি মালটি জিম ও একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম। কম্পিউটার ল্যাবরেটরী। এই সব নিয়েই আমাদের মহাবিদ্যালয় আজ সাবালকত্ব পেড়িয়ে প্রৌড়ের দিকে পা বাড়িয়েছে। নিজেকে এই ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে খুব গর্বিত মনে হচ্ছে।

আমার মায়ের যখন ২৫ (পঁচিশ) বছর হয়েছিল তখনও বেশ জাগজমক করেই তাঁর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। Silver Jubilee Memorial Building এখনও আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় "আমি রজন জয়ন্তীতে আত্ম প্রকাশ করেছিলাম। রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের (১৯৯৫) সময় আমি বয়সে ছিলাম তরুন, তখনও কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত ছিলাম। এখনও কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানকে পালিত করবার জন্য বিভিন্ন কাজের মধ্যে জড়িয়ে আছি। এটা ভাবলে মনটাকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। পাশাপাশি এটাও ভাবি যেদিন আমার মায়ের শতবর্ষ পালন হবে, তখন আমি সহ অনেকেই এই পৃথিবীতে থাকব না। কিন্তু সেদিন হয়তো এই মহাবিদ্যালয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরিণত হবে – এই আশা ও বিশ্বাস আমি রাখি।

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে না সুবর্ণ জয়ন্তী অনষ্ঠান ভালোভাবে হল এই তুলনায় আমি যাচ্ছি না। কারণ করোনা ভাইরাসের দাপটে সারা পৃথিবীর মানুষ আজ সন্ত্রস্ত। অনেককে আমরা হারিয়েছি। এখনও অনেকে ভয়ে কাপছে। তাই সুবর্ণ জয়ন্তী সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবার জন্য অনেক কর্মসূচী নেয়া হলেও এই একটি মাত্র কারণের জন্য তা বাস্তবায়িত কররা গেলনা। এই অক্ষেপ চীরজীবন থেকে যাবে। যদিও এই কোভিড–১৯ কে কেন্দ্র করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষাকর্মী ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের আর্থিক সহযোগিতায় দু দফায় মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে দুস্থ্য ছাত্র–ছাত্রীদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা গেছে। এটা অনেকের মতো আমিও ভালো দিক বলে মনে করি। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমরা এসে পৌছেছি। চেস্টা হচ্ছে সমাপ্তি অনুষ্ঠানটা কি করে সুন্দর করে তোলা যায়। কথায় আছে – All well that ends well !

প্রথমেই মহাবিদ্যালয়কে "মা" বলে উল্লেখ করেছি। তাই মায়ের সাথে যে স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তার কিছুটা অন্তত ব্যক্ত না করি তাহলে আমার মধ্যে যে এক অপরাধবোধ কাজ করবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সালটা ছিল ১৯৮০। ওই বছরই তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এইচ.এস. পাশ করে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে বি.এ. প্রথম বর্ষে (পাশ কোর্স) ভর্ত্তি হই। উল্লেখ্য তখনও মহাবিদ্যালয়ে কোন বিষয়েই অনার্স কোর্স চালু হয় নি। শিক্ষক– শিক্ষা কর্মীর সংখ্যা ছিল কম, ছাত্র–ছাত্রীও সংখ্যায় কম। উচ্চ মাধ্যমিক চালু থাকায় ওটাতেই বেশী ছাত্র–ছাত্রী পড়াশুনা করত। তুফানগঞ্জ এলাকার কিছু মানুষ এই মহাবিদ্যালয়কে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেন। আজ আর মায়ের সেই দিন নেই, অনেক দূর–দূরান্ত থেকে ছাত্র–ছাত্রীরা এখানে ভর্ত্তি হতে আসে। সারা উত্তরবঙ্গের মানুষ কিন্তু আমাদের মহাবিদ্যালয়ের নামটাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। মহাবিদ্যালয়ে অনেক কিছু থাকলেও আবার নেই ও। আছে যেটা সব সময় সব মানুষের মধ্যে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, কি নেই? মহাবিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিল্ডিং থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না কারণ, মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের সিংহ ভাগ জায়গাতে তুফানগঞ্জ জহর নবোদয়ের বিদ্যালয়ের পঠন–পাঠন চলছে, মহাবিদ্যালয়ে গার্লস্ হোস্টেলে নবোদয়ের ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষকরা থাকছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষর হাজারো অনুরোধ সত্ত্বেও তারা সরে যাচ্ছে না। এটা অবিলম্বে সরানো দরকার। একটা ভালো সাইকেল স্ট্যান্ড, কার পার্কিং জোন, একটা আদর্শ বয়েজ কমন রুম, একটা অডিটোরিয়াম, একটা মিউজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োজন। বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জী সহ (যিনি ২০০৫ সালে ১লা জুলাই থেকে মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্বে আছেন) গোটা বর্তমান পরিচালন সমিতি এ ব্যাপারে সচেষ্ট। আমার বিশ্বাস এই সমস্যাগুলো অচিরেই মিটে যাবে।

মাত্র দুবছর পাশ কোর্সে এখানে অধ্যায়ন করেছি। সেটাই ছিল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে যা শিখেছি তার পূর্বে কোথাও আমার কপালে জোটেনি। আজ যে আমি দুচার কথা পত্রিকার জন্য লিখতে চেষ্টা করছি, সেটা সম্ভব হয়েছে আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদের জন্য। ইতিহাস বিষয়টা নিয়ে পড়বার জন্য উনার সংস্পর্শে আসতে পেড়েছিলাম। উনি আমায় হাতে ধরে প্রবন্ধ লেখা শিখিয়েছিলেন। পাঠ্য বইয়ের বাইরে আরও অন্যান্য বড় বড় সাহিত্যিকের বই কেন পড়া দরকার তা আমি উনার কাছে শিখেছি। উনার উৎসাহ দেবার কারণেই আমি তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় পত্রিকায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা "স্যার উইলিয়াম জোনস্" কে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তারপর মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকায় একে একে অনেক প্রবন্ধ এমনকি একটা গল্প পর্যন্ত লিখেছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল, I can do it। আরও একজন আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্যামাপদ দত্তের কাছ থেকে নিয়মানুবর্তিতা, মূল্যবোধ প্রথাগত পড়ার বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়। সেই পাঠ তার কাছ থেকেই পাওয়া। দর্শন বিষয় থাকার কারণে এথিকস্ বিষয়টা উনিই পড়াতেন। এরপর আমার এক শিক্ষাগুরু অধ্যাপক অমল কুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে ইংরেজী বিষয়টা জেনেছি। ইংরেজীতে কতগুলি জীবন ধর্মী, বাস্তব ধর্মী কোর্ট উনি ক্লাসে বলতেন যেমন 'Not a lender, nor a borrower be'. 'Marriage is the trust of life'. 'A station master minds the train and a teacher trains the mind'. উনি শিখিয়েছিলেন মানব জীবনে tragedy ও comedy দুটোই থাকবে। তাই কমেডির পাশাপাশি ট্র্যাজেডিটাকেও মেনে নিতে হবে। কোন খারাপ পরিস্থিতি এলেই বলতেন, This is the tragedy of life। আরও শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মনসিজ মোহন সরকার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শ্রদ্ধেয় অভিজিৎ রায় (ইতিহাস), শ্রদ্ধেয় অমরজ্যোতি মজুমদার। উনারাও খুব দরদ দিয়ে পাঠ দান করতেন, সেগুলোতে আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি। আমার বাংলা ছিল না তাই বাংলা বিষয়ের অধ্যাপকদের সাথে তেমন একটা যোগাযোগও ছিলনা। তবে একজনের সাথে ছিল, তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সন্তোষ কুমার সাহা। পড়াশুনার বাইরে মনটাকে হালকা করবার জন্য উনার সাথে indoor games গুলো বিশেষ করে table tennis, carrom ইত্যাদি খেলা গুলো উনি হাতে ধরে শিখিয়েছেন। Carrom ছোটে বেলাতে খেললেও table tennis টা এই মহাবিদ্যালয়ে উনার কাছ থেকে শিখেছি। এভাবে দুটো বছর কিভাবে যে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি।

১৯৮৩ সাল ১৫ই মার্চ আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন আনন্দের দিন। (বয়স তখন ২১ বছর) লিখিত পরীক্ষা (ইংরেজী, অঙ্ক, সাধারণ জ্ঞান) টাইম টেস্ট, সবশেষে মৌখিক, যাকে এখন বলে Personality Test –এ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়ে মহাবিদ্যালয়ে একজন সাধারণ করণিক হিসেবে যোগদান করি। তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন সন্তোষ কুমার সাহা (১–১০–৮২ থেকে ১৩–৯–৮৪) দ্বিতীয় দফায় উনার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন। এই শিক্ষা কর্মী রূপে ৩৯ বছর পার করে মহাবিদ্যালয়ে আমার জার্নির শেষ লগ্নে এসে পৌঁছেছি। এই ৩৯ বছর মানে জীবনের অধিকাংশ কাল সেবা করার মাঝে অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। প্রথমত সেবা করার মাঝে আমি ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে একটা দীর্ঘ সময় (১৪–৯–৮৫ থেকে ৪–২–৯২ সাল পর্যন্ত) আমি আমার অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অমল কুমার চক্রবর্তীকে পেয়েছি। যার বিভিন্ন কাজে উৎসাহ দেবার প্রক্রিয়া কোন দিনও ভোলা যাবে না। চাকুরীর প্রথমকালে আমি ও আমার সহকর্মী শ্রী গণেশ চন্দ্র বর্মা এন.এস.এস. –এর (জাতীয় সেবা প্রকল্প) সাথে যুক্ত থাকার সুবাদে উনাকে এন.এস.এস. –এর প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে পেয়েছিলাম। উনার প্রথম লক্ষ্যই ছিল যত পারো গাছ লাগাও অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ। গাছকে উনি খুব ভালোবাসতেন। ছাত্র–ছাত্রীরা যেমন কলেজ চত্বরে বা তার বাইরে গাছ লাগিয়েছে তেমনি উনার সাথে সাথে আমরাও গাছ লাগাতে বাধ্য হয়েছি। কলেজে বর্তমানে অনেক গাছ নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও অনেক গাছ বেঁচে আছে যেগুলো সে সময়কার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। অধ্যাপক অজয় কুমার সাহা এরপর এন.এস.এস.–এর প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে দায়িত্ব নেন। সে সময় আমরা জোড়াই হাইস্কুলে, বালাভূত হাইস্কুলে, ধলপল হাইস্কুল ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে ছাত্রদের নিয়ে দশদিনের শিবির করে থেকেছি। প্রত্যেকটি জায়গায় খুব সাফল্যের সাথে শিবিরগুলো শেষ হয়েছে। এখানেও অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, যা লিখে শেষ করা যাবে না। এরপর অধ্যাপক কিশোর চট্টোপাধ্যায়, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়ের এন.এস.এস.–কে উচ্চ পর্যায়ে পৌছে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। এটাকে অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই অবশ্য ততদিনে আমিও গণেশ চন্দ্র বর্মা, কালের নিয়মে এন.এস.এস. থেকে বিযুক্ত হয়ে গেছি।

ছাত্র অবস্থায় মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে ভালোবেসেছিলাম। সেটা কর্মজীবনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার পেছনে প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক ড. দিলীপ কুমার দের (কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন) অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। উনি গ্রন্থাগারটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় একজন চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষা–কর্মী হিসেবে কলেজে যোগদান করে সে অবস্থাতেই M.A. in Bengali ইত্যাদি ডিগ্রি অর্জন করে শেষে গ্রন্থাগারিক হয়েছিলেন। এমনকি পি.এইচ.ডি. করে শেষে ডক্টরেটও হয়েছিলেন। পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই উনি সেটা প্রমাণ করে গেছেন। উনি অসাধারণ হয়েও সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মহাবিদযালয়ের ইতিহাসে একজন আদর্শ শিক্ষাকর্মী হিসেবে চীরকাল স্মরণে রয়ে যাবেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

আমার পরম সৌভাগ্য আমি অফিসে যোগদান করেই পূর্বসূরী হিসেবে পেয়েছিলাম প্রধান করণিক মাননীয় ব্রজদুলাল পাল মহাশয়কে। কোন কাজ গুছিয়ে করার ব্যাপারে যার জুরি মেলা ভার। অংক ও ইংরেজীতেও প্রচন্ড দক্ষতা। দেখে দেখেই ওনার কাছ থেকে অনেক কাজ শিখেছি। মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই উনি ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর প্রায় দশ বছর যান্মানিক ভাতা দিয়ে ব্রজদাকে মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অফিসের কাজে যুক্ত রেখেছেন। আমি মনে করি এ সম্মান উনার প্রাপ্য ছিল। আর একজন হলেন মাননীয় প্রলেন্দ্র নাথ অধিকারী, যাকে কোন কাজে আমি না বলতে শুনিনি। প্রচন্ড ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি। কথা কম, কাজে বেশী যার অন্যতম গুণ। কর্ম জীবনে আমার আদর্শ ব্যক্তি। হাতে লেখা অসাধারণ। যাকে কোন দিন ভুলতে পারবে না। শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা কম থাকায় শম্ভু চন্দ্র দাস (শম্ভু দা) সহ আর বাকিরাও মহাবিদ্যালয়ে ওয়ার্ক কালচারটা বজায় রেখে চলতেন আমার সাথে ও পরে অনেকেই শিক্ষাকর্মী হিসেবে

যোগদান করেছেন। তার মধ্যে অনেকেই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র অর্থাৎ সন্তান। বেশীর ভাগই ওয়ার্ক কালচারে বিশ্বাসী।

মহাবিদ্যালয়ে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে ১৯৯৪–৯৫ শিক্ষাবর্ষে, যখন মহাবিদ্যালয়ে তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় (১–৯–৯২ থেকে ৩১–৩–২০০২ পর্যন্ত) ও পরিচালন সমিতির সহযোগিতায় উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা ও রসায়ণ বিষয়কে নিয়ে পাশ কোর্সে বিজ্ঞান বিভাগ খোলে। তারপর থেকে মহাবিদ্যালয়কে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এরপর ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী অন্যত্র চলে যাবার পর আর কেউই যখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন না, তখন মহাবিদ্যালয়ের হাল ধরেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে মাননীয় সুলতান লাল রহমান মহাশয় (১১–১০–২০০২ থেকে ৬–১–২০০৫ তারিখ পর্যন্ত)। তিনিও অতি সুন্দরভাবে সঠিক ভাবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। বতমান অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চ্যাটার্জী যিনি গত ৭–১–২০০৫ ইং তারিখ থেকে মহাবিদ্যালয়ে বিরাজমান। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও বর্তমান মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় অনন্ত কুমার বর্মা ও বাকি সদস্যদের সহযোগিতায় মহাবিদ্যালয়ে একের পর এক উন্নয়ন ঘটে চলেছে ও চলবে বলেই আমার বিশ্বাস। মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে পড়াশুনার মান কিছুটা উঠা নামা করছে। আমি মনে করি ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামাজিক অবক্ষয়, ভোগ–বাদ এর অন্যতম কারণ।

মহাবিদ্যালয়ে একটি এমপ্লয়িজ কো–অপারেটিভ সোসাইটি আছে। আপ্রাণ চেষ্টা করে তৎকালীন সমস্ত শিক্ষাকর্মী ও অধিকাংশ শিক্ষকের সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে সেটা খোলা গেছে। বর্তমানে যার সদস্য সংখ্যা ৪০ (চল্লিশ)। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আমি, অধ্যাপক সুলতান রহমান বাকি দুজন শিক্ষাকর্মী শ্রীমতি ঝর্ণা বর্মা ও ছোটেলাল বাসফোর শুধুমাত্র রয়েছি। সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপদের সময় সোসাইটির সদস্যদের ঋণ দেয়া। এখন একে বাচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার।

দুটি দুঃখজনক ঘটনা যা আমি মন থেকে কোন দিনই মুছে ফেলতে পারবো না, প্রথমটি হল যে দিন (১৮/৫/১৯৯৮) আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদ পরীক্ষার কক্ষে ইনভিজিলেশন শেষ করে অফিসে আসবার সময় প্রবল শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হন তারপর হাসপাতালে নিতে নিতেই আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। যাকে অনেক চেষ্টা করেও আর বাঁচানো গেল না। আমি আমার চোখের সামনে আমার প্রিয় মানুষটাকে হারিয়ে যেতে দেখলাম। আর একটি হলো শিক্ষাকর্মী দোলেন্দ্র বর্মন গত ২৭/৮/২০২১ ইং তারিখে বেশ কিছুদিন লিভার জনিত কঠিন রোগে ভুগে মাত্র দশ বছর এক দিন চাকরী করবার পর আমাদের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন। কি করে ভুলব তাকে? সে যে ছিল সদা হাস্যময়। যে কোন কর্মীর বিপদের বন্ধু। রাজনীতি করলেও তার উর্দ্ধে কথা বলা যায়, এটা দেখিয়ে গেছে দোষ গুণ নিয়েই মানুষ তাই গুণের পরিমাণ বেশী থাকায় তার কোন ত্রুটি আমাদের চোখে ধরা পড়েনি।

আজ আমার চাকুরী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বলব যিনি আমাকে বলতে শিখিয়েছেন, লিখতে শিখিয়েছেন, কাজ করবার ধৈর্য্য দেখিয়েছেন, সৎ থাকবার সাহস যুগিয়েছেন, সর্বপরি আমার অন্নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি হলেন আমার "মা"। আমার তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। যার ঋণ কোনদিন শেষ হবার নয়। জন্মান্তরবাদ বলে যদি কিছু থাকে, পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে, তাহলে পরজনমে যেন আবার আমার প্রাণের মহাবিদ্যালয়ের সেবা করবার সুযোগ পাই, বাকি ঋণ না হয় তখন শোধ করবার চেষ্টা করব।

এই সুবর্ণ জয়ন্তীর ও আমার বিদায়লগ্নে মা তোমাকে শতকোটি প্রণাম জানাই – মা তুঝে সেলাম।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন

স্বপন কুমার আইচ
প্রাক্তন ছাত্র, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই, এবং এই প্রতিফলন ঘটতেই থাকবে, একথাও আমরা হলফ করে বলতে পারি। যেমন, আজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যাপকতা দেখা যাচ্ছে – তা কিন্তু বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন। বিবেকানন্দের সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এত ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রবাহ ছিল না। আর সে সময়ে (তা আজও সত্য) আমাদের দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে ইউরোপের দরিদ্র মানুষদের যে পার্থক্য ছিল তা হচ্ছে শিক্ষাগত।

বিবেকানন্দ ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেখানকার গরীব মানুষদের দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার গরীব মানুষেরাও কত সুখে থাকে, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। বিদ্যার ক্ষেত্রেও তারা কত এগিয়ে। এসব দেখে স্বামীজীর নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যেত। দেশের গরীব মানুষদের কথা মনে পড়ে যেত। তার দুচোখ জলে ভরে যেত। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন – "ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এই পার্থক্য হইল? শিক্ষা –জবাব পাইলাম।"

বিবেকানন্দ হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা। তাই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা বার বার বলেছেন। এ বিষয়ে সঠিকভাবে নজর দেওয়া হয়নি বলেই ভারতবর্ষের ব্যাপক সর্বনাশ হয়েছে। শিক্ষা–দীক্ষা এক অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও আজ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে স্কুলছুট ও দলিতদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলছে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী – "যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি – রাজশাসন ও *দম্ভবলে* দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি *পুনরায়*আমাদের উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি, বর্তমান শিক্ষা–ব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচারের যে প্রয়াস, তা বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শনের প্রতিফলন।

আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশীরভাগ মানুষই শিক্ষা বলতে বুঝি কতকগুলি শব্দ শেখা। শব্দগুলো শিখে ডিগ্রি অর্জন। আমাদের মধ্যে যে সুকোমলবৃত্তি রয়েছে, সে বৃত্তিগুলোর শক্তিসমূহের বিকাশের দিকে সাধারণতঃ নজর থাকে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন – "শিক্ষা বলিতে কতকগুলো শব্দ শিক্ষা নহে, আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তি সমূহকের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে।"

আজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষার মধ্যে অনেক নতুন নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। শুধুমাত্র শব্দ শিখার উপরেই শিক্ষার গুরুত্ব আর থাকছে না। আমাদের মধ্যে যে সুকোমলবৃত্তিগুলো রয়েছে, আমাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে, রয়েছে অপূর্ব সৃজনাত্মক মেধা বা প্রতিভাসমূহ – আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাতে কিন্তু এসবের বিকশিত বা প্রকাশিত করবার পদ্ধতিগত নব নব ধারা সংযোজিত হয়েছে। এ সকলই বিবেকানন্দের শিক্ষা–দর্শনের প্রতিফলন।

আজকের শিক্ষা–ব্যবস্থায় যে ইতিবাচক ভাব প্রবলভাবে আচ্ছাদিত হচ্ছে, তাও বিবেকানন্দের শিক্ষা–দর্শনের

প্রতিফলন। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন – মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে। আছে পরিপূর্ণতা। প্রথম থেকেই যা বিরাজমান। আর এই পরিপূর্ণতা বিকাশের সঙ্গেই শিক্ষার সম্পর্ক। বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে – " মানুষের ভিতরে যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা।"

আজ "ঈশ্বর কণা" বিষয়টি নিয়ে সমগ্র বিশ্বই আলোড়িত। বিজ্ঞানীরা অণু–পরমাণুকে বিশ্লিষ্ট করতে করতে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের মধ্যেও অনন্ত শক্তির খেলা দেখতে পাচ্ছেন। তাই বিজ্ঞানের ভাবনাতেই আমরা ভাবতে পারি, মানুষের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে পূর্ণত্ব প্রথম থেকেই রয়েছে। বিবেকানন্দের এই ইতিবাচক ভাবনাই আজকের শিক্ষা–ব্যবস্থায় প্রবলভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে।

অনেকসময় আমরা শিক্ষক–শিক্ষিকা অভিভাবক–অভিভাবকেরা বলে থাকি – এ ছেলেটির দ্বারা কিছু হবে না, তুই কিচ্ছু পারিস না, তোর দ্বারা কিছু হবে না, তুই বোকা, তুই গাধা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো নেতিবাচক ভাব। শিশুদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, সে বিশ্বাস হবে গভীর। তাদের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। রয়েছে পরিপূর্ণতা। তারা যাতে নিজেরা চিন্তা করতে পারে, সে ব্যাপারেও প্রেরণা যোগাতে হবে। এ ব্যাপারে বিবেকানন্দের নির্দেশ – "শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে। শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সময় আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শেখে, সেই বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা মানুষ হইবে এবং জীবন সংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।"

আমাদের আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মৌলিক চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে, তা কিন্তু বিবেকানন্দের শিক্ষা – দর্শনের প্রতিফলন। বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষ গড়া। শুধুমাত্র তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। শুধুমাত্র তথ্যের উপর ভিত্তি করে যে শিক্ষা, সে শুধু তোতাপাখিই সৃষ্টি করে, যন্ত্রের মতো। এর দ্বারা কল্যাণকর বা মহৎ কিছু সৃষ্টি হয় না। যে শিক্ষা জনসাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করবে। চরিত্রবল এনে দেবে, পরার্থে তৎপরতা এনে দেবে, এনে দেবে সিংহসাহসিকতা। তাই প্রশ্নাকারে বিবেকানন্দ বলেছেন – "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?"

নারীদের শিক্ষার বিষয়ে বিবেকানন্দ অনেক কথাই বলেছেন। নারীদের পাঠক্রমের পাশাপাশি নতুন কিছু বিষয় তিনি যোগ করেছেন। যেমন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সূচীশিল্প, রন্ধনবিদ্যা, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প, ঘরকন্না, শরীর পালন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় এক শতাব্দীরও আগে বিবেকানন্দ স্ত্রী বা নারী শিক্ষার বিষয়ে এসকল কথা বলে গেছেন। আজ নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সবগুলোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে।

বিবেকানন্দ মনে করতেন – ছাত্রীদের সামনে সবসময় ভারতীয় আদর্শ নারীদের চরিত্রের সৌন্দর্যের মাধুর্য্যতা তুলে ধরতে হবে, তুলে ধরতে হবে তাঁদের উচ্চ ভাব সম্পন্ন ত্যাগের ঐশ্বর্য্য। যাতে ছাত্রীদের এ বিষয়ে প্রবল অনুরাগ জন্মে। বুঝিয়ে দিতে হবে সীতা, সবিত্রী, দময়ন্তী, লীলবতী, খনা, মীরা এমন সব উচ্চ আদর্শের অমৃতকথা, যাতে মেয়েরা নিজেদের জীবন সেইভাবে গঠন করতে পারে। সত্যিকারের কিছু শিক্ষা তাদের দিতে হবে। স্বামীজীর ভাষায় ঃ "খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে এই রকম শিক্ষা চাই। ঐ রকম শিক্ষা পাইলে মেয়েদের সমস্যা মেয়েরা আপনারাই সমাধান করিবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপ্যানে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছে। একটা কিছু হইলে কেবল কাঁদিতেই মজবুত।

বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময় তাহাদের মধ্যেও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। দেখ দেখি, ঝাঁসীর রাণী কেমন ছিলেন।"

আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরেই নারীদের যে উত্থান বা অবস্থান, তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার প্রতিফলন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি – আমরা যেন মনে না করি বিবেকানন্দ শুধুমাত্র শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা করেই ক্ষ্যান্ত থেকেছেন। তা কিন্তু নয়, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলোতে বিবেকানন্দের শিক্ষা–চিন্তা সুচারুরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই পরিশেষে বলা যায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন পর্যায়েই বিবেকানন্দের শিক্ষা–চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

ভারী ধাতুযুক্ত শাকসব্জীর ব্যবহার – মানবস্বাস্থ্যের এক চরম বিপদ

অভিষেক সাহা
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

বর্তমানে কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমির মধ্যে ভারী ধাতুর উপস্থিতি পরিবেশের পক্ষে অতি তাৎপর্যপূর্ণ এক চরম বিপদ। কলকারখানার দূষিত বর্জ্যের জলে বা দূষিত বর্জ্যযুক্ত স্থান ধুয়ে যাওয়াই হোক অথবা পরিস্রুত জলের সেচের কাজে ব্যবহারের অপ্রতুলতা, এসবই কৃষিজমিকে বিষাক্ত করে তুলছে। দূষিত নদীর জল, কলকারখানা ও নর্দমার দূষিত জলে সেচের কাজে ব্যবহারে মাটি হয়ে যাচ্ছে দূষিত, যা শাকসব্জীকে বিষাক্ত করে তুলছে। বিষাক্ত শাকসব্জী খেয়ে মানুষের শরীর–স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। খাদ্য শৃঙ্খলে বিষাক্ত ধাতুগুলি ঢুকে মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও নানা রোগ ব্যাধির জন্ম দিচ্ছে।

শাক সব্জীতে ভারী ধাতুগুলির উৎস কোথায়?

কিছু কিছু ভারী ধাতু স্বল্পমাত্রায় (তামা, লোহা, নিকেল, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ) অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক রূপে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হলেই তা বিষ। প্রাকৃতিক কারণের সাথে সাথে মানুষের অতি সক্রিয়তায় পরিবেশে ভারী ধাতুর পরিমাণ বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। শাক সব্জীর ফলন বাড়াতে কৃষক ব্যবহার করছে জৈব, অজৈব সার, নর্দমার কাদামাটি যুক্ত পলি, কালখানার বর্জ্য মিশ্রিত জল, আবার কখনো নর্দমার অপরিশোধিত জল, যার ফলে কৃষি জমিতে মিশছে ভারী ধাতু।

একনজরে –

ভারী ধাতুর উপস্থিতি কোথায়	কারণ কী?	কোন ভারী ধাতু?
মাটি	খনিজ উত্তোলন	আর্সেনিক, নিকেল, কোবাল্ট, কপার
মাটি	নর্দমার জলসেচের কাজে ব্যবহার	আয়রণ, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, লেড, জিঙ্ক ক্রোমিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, ক্যাডমিয়াম
মাটি এবং শাকসব্জী	কীটনাশক / ছত্রাকনাশক জৈব, অজৈব সার	ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, কপার
মাটি	খনিজ উত্তোলন বা ধাতু বিগলন	ক্যাডমিয়াম, কপার, জিঙ্ক
শাকসব্জী	শোধিত বা অপরিশোধিত জলের সেচের কাজে ব্যবহার	ক্যাডমিয়াম, লেড, নিকেল

শাকসব্জীতে ভারী ধাতুর উপস্থিতির নেপথ্যে –

বিভিন্ন উৎস থেকে আসা ভারী ধাতু মিশছে মাটিতে যা গাছের শিকড় দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে শাকসব্জীর পাতা, ফুল, ফল সহ তার যাবতীয় অঙ্গে, সেচের জলের উৎস মাটির প্রকৃতি এবং ভারী ধাতুর বিভিন্নতার উপরে নির্ভর করছে কি পরিমাণ ভারী ধাতু জমবে শাকসব্জীতে।

শাকসব্জীতে ভারী ধাতুর উপস্থিতি নির্ভর করে মূলতঃ যে কারণগুলির উপর তা হল –

ক) ভারী ধাতুর উৎস খ) শাকসব্জীর প্রকৃতি গ) শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চল ঘ) আবহাওয়ার পরিবর্তন।

একই সব্জী শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে উৎপাদনের বিভিন্নতার কারণে দেখা যাচ্ছে শহরাঞ্চলে উৎপাদিত সব্জীর মধ্যে ভারী ধাতুর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি। শশা, টমেটো, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, বীন, কুমড়ো যখন শহরাঞ্চলে উৎপাদিত হচ্ছে তার মধ্যে ক্যাডমিয়াম (০.৩৪ – ০.৯৭) মি.গ্রা./ কেজি, লেড (৫.৩ – ১০.৭) মি.গ্রা./ কেজি, কপার (৩২.৬ – ৭৬.৫) মি.গ্রা./ কেজি, নিকেল (১.৮ – ১৩.৪) মি.গ্রা./ কেজি। যেখানে গ্রামাঞ্চলে ঐ উৎপাদিত সব্জীর মধ্যে ক্যাডমিয়াম (০.২৪ – ০.৬৩) মি.গ্রা./ কেজি, লেড (৩.০০ – ৮.০০) মি.গ্রা./ কেজি, কপার (২২.১৯ – ৬০.৪০) মি.গ্রা./ কেজি, নিকেল (০.৪৪ – ৪.১০) মি.গ্রা./ কেজি বর্তমান। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে খুব সহজেই অনুমেয় ভারী ধাতুর শাক সব্জীতে উপস্থিতির ক্ষেত্রে শহরাঞ্চল বা গ্রামাঞ্চল লাগোয়া পরিবেশের কতটা ভূমিকা।

শুধুমাত্র পরিবেশ নয়, শাকসব্জীর প্রকৃতির উপরও নির্ভর করে কতটা ভারী ধাতু শাকসব্জীতে সঞ্চিত হচ্ছে। দিল্লী শহরাঞ্চলে করা এক সমীক্ষায় দেখা যায় পালং শাকের মধ্যে কপার, জিঙ্ক, ক্যাডমিয়াম, লেড–এর উপস্থিতি ঢ্যাঁড়শ –এর তুলনায় অনেকগুণ বেশী। বাঁধাকপির মতো পাতাযুক্ত শাকসব্জীতে কপার, ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি অনেক বেশী, পাতাবিহীন শাকসব্জী যেমন টমোটো, বেগুন, ঢ্যাঁড়শের তুলনায়।

আবহাওয়া জনিত পরিবর্তন ও শাকসব্জীর মধ্যে ভারী ধাতুর উপস্থিতির তারতম্যের অন্যতম একটি কারণ। আমাদের দেশে করা এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ক্যাডমিয়াম, জিঙ্গ, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এই সমস্ত ভারী ধাতুগুলির উপস্থিতি গ্রীষ্মকালে অনেক বেশী। যেখানে শীতকালে কপার, লেড, নিকেল এবং ধাতুগুলির উপস্থিতি বেশী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মাটির আম্লিকতা বা ক্ষারকীয়তার উপরেও নির্ভর করে শাকসব্জীতে কি প্রকৃতির ধাতুর উপস্থিতি ঘটবে এবং তার পরিমাণ কত হবে।

ভারী ধাতুযুক্ত শাকসব্জী খেলে শরীরের উপর কি বিরূপ প্রভাব পড়বে ?

ভারী ধাতুযুক্ত শাক সব্জী খেলে শরীরে নানা রোগব্যাধির প্রকোপ দিনে দিনে বাড়তে বাধ্য। যদি ক্যালসিয়াম, আয়রণ, জিঙ্ক যুক্ত খাবার কোন ব্যক্তি কম পরিমাণে গ্রহণ করে তবে বিষাক্ত লেড ধাতু শরীরে সঞ্চিত হওয়ার মাত্রার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যা ব্যক্তি গ্রহণ করে তার খাবারের থেকেই। যেহেতু ভারী ধাতুগুলি স্থায়ী প্রকৃতির এবং পরিবেশে পচনশীল বা ক্ষয়রোগ্য নয়, তাই এই ধাতুগুলি কিডনি, হাড় এবং যকৃতে জমতে থাকে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন রোগব্যাধির সৃষ্টি করে। শরীরে ভারী ধাতুর দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে WHO বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, THQ (Target Hazards Quotient) নামে একটি সূচক নির্ধারণ করেছে, যা ক্যানসার ঘটিত বা ক্যানসার ঘটিত নয় এই দুই ধরণের বিষযোগ্য ধাতুকেই বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখেছে। এক ব্যক্তি কতবার ভারী ধাতুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রতি বছরে, এক ব্যাক্তির জীবনকালের পরিসর, প্রতিদিন খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ, ভারী ধাতব খাদ্যে কী পরিমাণে রয়েছে, ব্যক্তির গড় ওজন এবং ক্যানসার ঘটিত নয় এমন ধাতুর দ্বারা ব্যক্তি যে সময়কাল অবধি অতিবাহিত করেছে, এসবই THQ এর মান নির্ধারণে বিবেচনার জন্য বিচার্য। THQ>1.0 অর্থাৎ এর মান এক –এর বেশী হলেই ধরা হয় ব্যক্তিটির শরীরে ভারী ধাতুর প্রভাবে ব্যক্তি স্বাস্থ্যহানীর দিকে কয়েক কদম পা বাড়িয়ে ফেলেছে।

পরিশেষে, ভারী ধাতুর শাকসব্জীতে অর্ন্তভুক্তি আজ এক জ্বলন্ত সমস্যা। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যার দ্বারা দূষিত মাটি এবং জল থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভারী ধাতুগুলি দূর করা যায় বা বিপদসীমার নীচেই তাদের

মানকে ধরে রাখা যায়। নাহলে খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে ভারী ধাতুগুলির মাত্রাতিরিক্ত প্রবেশ প্রাণীকূল তথা সমগ্র মানবজাগতের কাছে এক ভয়ানক বিপদ হিসাবে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। সেচের কাজে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতেই হবে। যে সমস্ত কৃষিজমি ভারী ধাতুর মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির জন্য চিহ্নিত হবে, সেগুলিতে শাকসব্জী নয়, বরং সে সমস্ত জমিতে ফুল বা শাল, সেগুন, শিশু, মেহগনির মতো গাছের জন্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিপদ যেখানে শিয়রে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে সেখানে আর বিলম্ব করা মানে ক্ষতিকে সাদরে আমন্ত্রণ জানানো।

মানবসভ্যতা, একটি বহুরূপী মৌল এবং জলবায়ু পরিবর্তন – এক আসন্ন মহাবিপর্যয়

Dr. Babli Roy
Department of Chemistry
Tufanganj Mahavidyalaya

"Our house is on fire. I want you to panic"- Greta Thunberg.

পৃথিবীতে বসবাসকারী আনুমানিক ৮৭ লক্ষ বিভিন্ন জীবপ্রজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উন্নতিমস্তিষ্কসম্পন্ন মানবজাতিই একমাত্র প্রজাতি যে নিজের বুদ্ধিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছে, নিজের জীবন–যাত্রার মান উন্নত থেকে উন্নততর করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে অভূতপূর্বভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতের মুঠোয় করেছে বিভিন্ন জটিলরোগকে এবং মানুষ হয়েছে দীর্ঘজীবী।

প্রযুক্তির সাহায্যে বর্তমানে মানুষ ঘরের এক কোণে বসেও হয়ে যেতে পারে বিশ্বনাগরিক; পরিদর্শন করতে পারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ; বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতিবাদেও হতে পারে সামিল। মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহের মাধ্যমে শত্রু দেশের আক্রমণ আঁচ করতে পারলে মানুষ আজ তা অতিদ্রুত প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে।

প্রযুক্তির ব্যবহারেই আজ একজন বিকলাঙ্গ অ্যাথলিট – কৃত্রিম অঙ্গের মাধ্যকে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে অলিম্পিকেও হারিয়ে দিতে পারে একজন সুস্থ স্বাভাবিক অ্যাথলিটকেও ! আজ প্রযুক্তি এতটাই উন্নতমানের যে, মানুষ আজ মানুষেরই হাত ছেড়ে হাত বাড়িয়েছে যন্ত্রের দিকে, বন্ধুত্ব করেছে তারই হাতের তৈরী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রমানবের সাথে! বিজ্ঞানেরই সাহায্যে মানবসন্তান জন্ম দিতে আজ আর শুধু মায়ের গর্ভের প্রয়োজন হয়না – একটি ভ্রূণ জন্মাতে পারে কাঁচের তৈরী পরীক্ষানলেও !

একের পর এক অসম্ভবকে সম্ভব করে মানুষ আজ বিশ্বকে প্রমাণ করেছে যে, এমন কিছু নেই যা মানুষ করতে পারবেনা। শুধু নতুন নতুন উদ্ভাবনই নয়, মানবসভ্যতা এটাও জানে কতটা নৃশংসভাবে একটি শত্রুদেশকে, সেই দেশের মানুষকে– তারই স্ব–প্রজাতিকে ধ্বংস করা যায়। তা সে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারই হোক অথবা রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগই হোক।

মানবপ্রজাতিই একমাত্র প্রজাতি যে নিজের সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে , আধুনিক থেকে আধুনিকতর এবং উন্নতমানের জীবনযাত্রার বাসনায় এখনও পর্যন্ত সৌরজগতের একমাত্র প্রাণের বাসযোগ্য গ্রহ,পৃথিবীর ভূগর্ভে সঞ্চিত বিভিন্ন উপাদানের ভান্ডারকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করে তার ভারসাম্য ব্যাহত করেছে। অন্যান্য প্রজাতি উদ্ভিদ থেকে অনুজীব পর্যন্ত সকলেই বরঞ্চ পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার্থে, বাস্তুতন্ত্র সঠিকভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায়। কিন্তু মানবজাতি পৃথিবী থেকে যতটা নিংরে নিয়েছে তার কতটা মাতৃ–ধরণীকে ফিরিয়েছে তা আজ প্রশ্নচিহ্নের মুখে ।

যে পৃথিবী জন্ম দিয়েছিলো মানবসভ্যতার, পর্যাপ্ত সুস্থ ও বাসযোগ্য পরিবেশ দিয়েছিলো মানুষকে দীর্ঘবছর বেঁচে থাকার, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সুস্থভাবে বাঁচার সেই মাতৃ–ধরণীকে ছেড়ে সেই মানবসভ্যতা নাকি আজ ভিন গ্রহের খোঁজে মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য !

একদিকে উন্নততর প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভিনগ্রহের খোঁজে মানবজাতি; অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অত্যাধিক ভূমিকম্প, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি , বন্যা, বিশ্ব–উষ্ণায়নের প্রভাবে জলের অভাব, খাদ্যের অভাব, বারংবার দাবানলে ভস্মীভূত বনাঞ্চল, এমনকি প্রাণহীন একটি সাধারণ চোখে অদৃশ্য ভাইরাস (SARS-Cov-2 বা করোনা ভাইরাস) সেই মানবজাতির জীবনকে প্রতিমূহূর্তে করে চলেছে বিপন্ন এবং দিশাহারা।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা বলছে, যে সমস্ত কারণে মানুষের জীবন বর্তমানে বিপর্যস্ত – তার প্রায় সবটুকুর জন্যই দায়ী স্বয়ং মানবপ্রজাতি ! শুধু তাই নয় – পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অন্যান্য প্রজাতির যেমন– উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অবলুপ্তির কারণও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবপ্রজাতি । শুধুমাত্র মানবসভ্যতার বাসস্থানের জন্যই ইতিমধ্যে অবলুপ্তি ঘটেছে অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতির, আমাদের প্রাণবায়ু ও খাদ্যের জোগানদাতার, যা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের জন্য তৈরী করেছে এক গভীরসংকট।

মানবসভ্যতার বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় কার্যকলাপের প্রভাবেই পৃথিবীর নিজস্ব গড় তাপতাত্রা বর্তমানে স্বাভাবিকের তুলনায় ১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গিয়ে পৃথিবীকে ক্রমেই করে চলেছে উত্তপ্ত। গবেগষণায় আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী ১৫ বছরেই পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস! আর এই বিশ্ব–উষ্ণায়নের ফলে শুধুমাত্র অন্যান্য প্রজাতি নয় অবলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে পারে মানবসভ্যতাকেও! বিনষ্ট করে দিতে পারে আমাদের মাতৃ–ধরণীকেও। তবে কি প্রাণের মত জন্ম আছে বলে মৃত্যুও হতে পারে আমাদের একমাত্র বাড়ি পৃথিবীর? মনে হচ্ছে, এ সব কিছুই যেন মানবসভ্যতার কাছে এক মহাবিপদ সংকেত। একবার অতীতে ফিয়ে যাওয়া যাক, তখনও পৃথিবীর নামক গ্রহটির জন্মও হয়নি । আনুমানিক ১৩.৮ শত কোটি বছর আগে বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকালে দুটি সবচেয়ে হালকা গ্যাসীয় মৌলেরও সৃষ্টি হয় – হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। আর এই দুটি মৌলের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিশ্বব্রহ্মান্ডে তৈরী হওয়া অগণিত নক্ষত্রদের জীবনীশক্তি।

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নক্ষত্র, সূর্যের মধ্যেও যে অকল্পনীয় শক্তি ও তাপমাত্রা আছে তার জন্যও দায়ী আসলে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম মৌলদুটি। সূর্যের মধ্যে অবিরত হয়ে চলা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসগুলির নিউক্লিও সংযোজন বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হচ্ছে হিলিয়াম গ্যাস এবং নির্গত করছে অকল্পনীয় শক্তি ও তাপমাত্রার। আর এই সৌরশক্তিই ছড়িয়ে পড়ছে সৌরমন্ডলের গ্রহ ও উপগ্রহে। যে সৌরশক্তির খুব সামান্য পরিমানই আমাদের একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরকে ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠতলে এসে পৌঁছায় যার ফল স্বরূপ পৃথিবী আলোকিত হয় আর পৃথিবীতে বাসস্থানকারী উদ্ভিদ ও জীবজগৎ পায় বেঁচে থাকার শক্তি।

বিশ্বব্রহ্মান্ডে সৃষ্টি হওয়া নক্ষত্রগুলির ভেতরে হাইড্রোজেনও হিহিয়াম মৌলদুটি ছাড়াও এই দুটি মৌলের নিউক্লিও সংযোজনের ফলে ধীরে ধীরে তৈরী হতে থাকে অন্যান্য মৌলগুলির , যেমন – লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আয়রণ ইত্যাদি হালকা থেকে আরো বেশি ভারী মৌলগুলি যা রসায়নের পর্যায়সারণীতে সজ্জিত । আর এমনি করেই বিশ্বব্রহ্মান্ডের এক একটি নক্ষত্রের অন্দরে "ট্রিপল আলফা প্রসেস" – সেখানে পরপর তিনটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরী হয় একটি বহুরূপী মৌল কার্বন (C) । বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ ঘটে –

$${}^{4}_{2}He + {}^{4}_{2}He \quad > {}^{8}_{4}Be\,(-0.0918\,Mev.)$$

$${}^{8}_{4}Be + {}^{4}_{2}He \quad > {}^{12}_{6}C + 2 \quad (+7.367\,Mev)$$

বিশ্বব্রহ্মান্ডে জন্ম নেওয়া অসংখ্য প্রায় দৈত্যাকার এক একটি নক্ষত্রের একসময় বিনাশও ঘটে প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'সুপারনোভা'। আর এক নক্ষত্রের মধ্যে তৈরী হওয়া ভারী মৌলগুলি ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্রহ্মান্ডের বিভিন্ন গ্যালাক্সিতে , গ্রহ থেকে গ্রহানুপুঞ্জে। আর ঠিক এইভাবেই একসময় বিশ্বব্রহ্মান্ডে উপস্থিত সর্বাধিক মৌলগুলির (হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং অক্সিজেন) মধ্যে একটি বহুরূপী মৌল 'কার্বন' এসে পড়ে পৃথিবীতে – যে মৌলটি সৃষ্ঠি করবে প্রাণের !

রসায়নের ভাষায় কার্বনের সাংকেতিক চিহ্ন ${}^{12}_{6}C$, যেখানে 6 সংখ্যাটি কার্বন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা যার অর্থ একটি কার্বন পরমাণুতে রয়েছে 6টি ইলেকট্রন, 6টি প্রোটন এবং 6টি নিউট্রন কণা । অন্যদিকে 12 সংখ্যাটি কার্বন পরমাণুর পারমাণবিক ভর যা আসলে কার্বনের নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন কণার যোগফল। কার্বন একটি

কঠিন এবং অধাতব মৌল । পৃথিবীতে প্রধানত কার্বনের তিনটি আইসোটোপ দেখা যায় – ${}^{12}_{6}C$, ${}^{13}_{6}C$ এবং ${}^{14}_{6}C$। যার মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ কার্বন যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় তা আসলে ${}^{12}_{6}C$ ।

এই কার্বন মৌলটি বিশুদ্ধভাবে অথবা যৌগ হিসেবে সঞ্চিত থেকেছে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর ভূ–পৃষ্ঠে, ভু–গর্ভে, সমুদ্রতলে, বায়ুমন্ডলে, শিলায় এবং পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের মধ্যে ।

এখনও পর্যন্ত মানুষের, আবিষ্কৃত পর্যায়সারণীর ১১৮ টি মৌলের মধ্যে একমাত্র কার্বনই সর্বাধিক সংখ্যক যৌগ তৈরী করার ক্ষমতা রাখে – যা প্রায় এক কোটিরও অধিক যার অবস্থান মেন্ডেলিভের পর্যায় সারণীতে যার অবস্থান চোদ্দ নম্বর শ্রেণী এবং দ্বিতীয় পর্যায়। অন্যান্য মৌলগুলির থেকে অনন্য ও ব্যতিক্রমী হওয়ার দরুণ 'কার্বন' মৌলটি রসায়নে একটি আলাদা জায়গা করে নিয়েছে যাকে আমরা "জৈব রসায়ন" বলে জানি যেখানে কার্বনভিত্তিক জৈবযৌগগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

কার্বনের এক বিশেষধর্ম "ক্যাটিনেশনের" মাধ্যমে কার্বন তার নিজের সাথে এবং অন্যান্য বিভিন্ন মৌলের সাথে রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত বিভিন্ন যৌগ উৎপন্ন করতে সক্ষম । বিশুদ্ধ কার্বন নিজের সাথে বন্ধনে যুক্ত হয়ে এইভাবেই তৈরী করতে পারে ফুটবলের আকৃতির 'ফুলারিন' যেখানে ষাটটি কার্বন পরপর যুক্ত হয় , যার সংকেত C_{60}। ফুলারিনের তড়িৎবহন ক্ষমতার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

কার্বন একটি বহুরূপী মৌল। প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে কার্বন অবস্থিত। যে পেনসিলটি দিয়ে মানুষ তার প্রথম হাতের লেখাটি খাতায় লেখে সেই পেনসিলের সিসটিও যেমন কার্বনের একটি রূপ 'গ্রাফাইট', অন্যদিকে মানুষের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহৃত অত্যন্ত দামী চকচকে হীরের টুকরোটিও আসলে কার্বনেরই আরেকরূপ – ডায়মন্ড ।

ফুটবলের মতো দেখতে বাকমিনস্টার ফুলারিন (C_{60}) অন্যদিকে একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর, সবচেয়ে পাতলা, মৌচাকের মতো দেখতে এক স্তরীয় এবং স্বচ্ছ কার্বনজাত পদার্থ 'গ্রাফিন' যার অস্বাভাবিক তড়িৎবহন ক্ষমতা, নমনীয়তা ইলেকট্রনিক জগতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে – দুটোই আসলে কার্বনেরই আরো দুটো রূপ। নমনীয় ও স্বচ্ছ বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যেমন – মোবাইল, ডিজিটাল ঘড়ি, ল্যাপটপ, টিভি ইত্যাদির সম্ভাবনার রাস্তা দেখিয়েছে এই বিস্ময়কর কার্বন পদার্থ 'গ্রাফিন'।

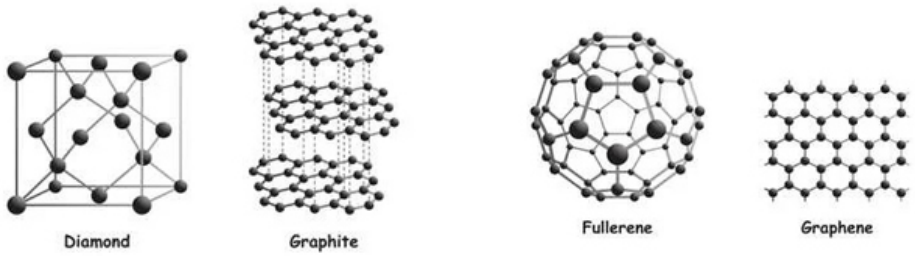

Fig-1: কার্বনের নিয়তাকার রূপভেদগুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রাফাইট, ডায়মন্ড, ফুলারিন, গ্রাফিন

এগুলি সবই কার্বনের কঠিন ও কেলাসাকার রূপ যাদের ব্যবহার ইলেকট্রনিক এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় রসায়ন বিজ্ঞানীরা এবং পদার্থ বিজ্ঞানীরা কার্বনের নতুন নতুন রূপের খোজে প্রতিনিয়ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে কয়লা, চারকোল, ভুসা কালি, গ্যাসীয় কার্বন ইত্যাদি সবই হল কার্বনের অনিয়তাকার রূপ। যাদের ব্যবহার আমরা দৈনন্দিন জীবনে করে চলেছি।

এই কার্বন মৌলটিই অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরী করেছে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস যা পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কার্বনের প্রধান ও প্রাথমিক উৎস । এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড একদিকে যেমন বায়ুমন্ডলকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে অন্যদিকে ঠিক তেমনি উদ্ভিদ প্রজাতি সেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং নিজেদের মধ্যে থাকা ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বনডাইঅক্সাইড থেকে কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজ অথবা শর্করা জাতীয় খাদ্য এবং জল উৎপন্ন করে। বিনিময়ে উদ্ভিদেরা প্রদান করে প্রাণবায়ু অক্সিজেন । উদ্ভিদজাতীয় খাবার গ্রহন করার মাধ্যমেই মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা নিজেদের শরীরে কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করে যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের বেঁচে থাকার শক্তি জোগায় । আবার এই কার্বোহাইড্রেট যৌগগুলিই সমস্ত জীবজগতের নিউক্লিক অ্যাসিড DNA (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) ও RNA (রাইবোনিউ ক্লিক অ্যাসিড তৈরীর ভূমিকা পালন করে। কার্বন ঘটিত অন্যান্য জৈবিক যৌগগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, পেপটাইড, এনজাইম হরমোন, DNA, RNA ইত্যাদি উপাদানগুলি নিয়ে অবশেষে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি হয় । আর এইভাবেই নক্ষত্রের গহ্বরে তৈরী হওয়া একটি বহুরূপী মৌল কার্বন হয়ে ওঠে পৃথিবীর সকল জীবজগতের সৃষ্টির (উদ্ভিদ, প্রাণী, অনুজীব) মূল উপাদান । একটি মানবদেহ থেকে যদি কার্বন ঘটিত যৌগগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বের করে নেওয়া হয় তাহলে যা পড়ে থাকবে, তা হোলো একটি ভঙ্গুর কঙ্কাল, জল এবং কিছু খনিজ পদার্থ (K, Ca, P, S, Na, Cl, Mg ইত্যাদি) - এর থেকেই উপলব্ধি করা যায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ তৈরীতে কার্বনের গুরুত্ব কতটা অনস্বীকার্য।

অতএব, একদিকে যেমন পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল প্রাণসৃষ্টির জন্য মূল উপাদান কার্বন, অন্যদিকে মানবসমাজের ন্যুনতম জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, জ্বালানী, বাসস্থান এবং পরিধান - সবগুলিরই মূল উৎস কার্বন । মানবসভ্যতার বিকাশের শুরু থেকে আধুনিক মানবসভ্যতার বিকাশ শিল্পায়ন থেকে বর্তমানে বিশ্বায়নে যে মৌলটি সবচেয়ে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি হোলো কার্বন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অভূতপূর্ব সাফল্যের পরেও পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির এবং জ্বালানীর প্রায় 40% আসে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে, যেমন - কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে যেগুলি মূলত কার্বন এবং কার্বনভিত্তিক জৈবযৌগ সমূহ। এই জীবাশ্ম জ্বালানীগুলি তৈরী হয়েছে বহু কোটি কোটি বছরপূর্বে বিভিন্ন ভূস্তরে। জীবাশ্মজ্বালানীর পরিমাণ সীমিত তাই এই শক্তিকে অচিরাচরিত শক্তিও বলা হয় যার মানে হোলো জীবাশ্ম জ্বালানীর অত্যাধিক ব্যবহারে পৃথিবীতে ভূগর্ভে সঞ্চিত এই শক্তির ভান্ডার একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাই বিজ্ঞানীরা এই জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প শক্তির খোঁজ প্রতিনিয়ত করে চলেছেন। জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প শক্তির খোঁজের আরও একটি বড় কারণ হোলো জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে সৃষ্ট গ্রীন হাইস গ্যাসগুলির যেমন - মিথেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বনমনোক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলকে প্রতিনিয়ত করে চলেছে স্বাভাবিক উষ্ণতার চেয়ে আরও উষ্ণতর যার ভয়াবহ ফলাফল গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব-উষ্ণায়ন যা ভাবিয়ে তুলেছে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের, পরিবেশবিদদের, পরিবেশসচেতন মানুষদের। পৃথিবীতে মানবসভ্যতার বিকাশের প্রয়োজনে শিল্পায়নের পর থেকে যেভাবে শিল্প গড়ে উঠেছে এবং জীবাশ্মজ্বালানীর ব্যবহার হয়েছে তাতে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাইসগুলির পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে গিয়ে বর্তমানে পৃথিবীর গ্লোবাল গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অত্যাধিক পরিমাণে বননিধন - যার ফলে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণের ভারসাম্য হারিয়ে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে।

বিশ্বউষ্ণায়নের ফলস্বরূপ আর্কটিক মহাসাগরের হিমশৈলগুলি আজ দ্রুতহারে গলতে শুরু করেছে যা সমুদ্রের জলস্তরকে বাড়িয়ে চলেছে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এর

প্রভাবে তলিয়ে যেতে পারে পৃথিবীর মানচিত্রের বহুদেশ। অন্যদিকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং – এর ফলেই হয়ে চলা বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পৃথিবীর মানব প্রজাতির সাথে সাথে অন্যান্য প্রজাতির উপরে ভয়ঙ্কর ভাবেই প্রকট হয়ে উঠছে । এই গ্লোবালওয়ামিং এর প্রভাবেই নিঃশব্দে অবলুপ্তির পথে বহু জীব প্রজাতি যারা পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল।

বিশ্ব–উষ্ণায়নের ফলেই বিশ্ববাসী দেখেছে নিজেদের দেশের সর্বোচ্চ উষ্ণতম দিন, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, পানীয় জলের অভাব, খাদ্যের অভাব–এ যেন মানবসভ্যতার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির এক ভয়ংকর অভিশাপ । বিভিন্ন দেশের মতোই আমাদের দেশেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যে অসময়ে হওয়া অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা, অতিরিক্ত উষ্ণতায় খরা, পানীয় জলের অভাব – যার ফলস্বরূপ বহু মানুষ আজ গৃহহীন । এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই বহু মানুষ আজ যাযাবর।

মানবসভ্যতার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর প্রভাবের কথা ভেবেই জাতিসংঘ তাই বিশ্বের প্রায় দুশোটি দেশের রাষ্ট্রনেতা, বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং বিভিন্ন দেশের পরিবেশকর্মীদের নিয়ে প্রতিবছর 'জলবায়ু চুক্তি সম্মেলনে' বসে পর্যালোচনা করেন এর সমাধান নিয়ে। কারণ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে যেভাবে প্রতিনিয়ত বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে তার দায় মানুষেরই। ইতিমধ্যেই বিশ্ব–উষ্ণায়নের প্রভাব প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষই কিছুটা হলেও আঁচ করতে পেরেছেন। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে, আর্থিক লাভের স্বার্থে বহুদেশের রাষ্ট্রনেতারা এখনও পর্যন্ত সেই সমস্ত শিল্পকারখানাগুলিকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা জোড়ালোভাবে বলেননি যে শিল্প কারখানাগুলি থেকে সবচেয়ে বেশি গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির নির্গমন ঘটে। এখনও বিশ্বের বহু নামীদামী শিল্প কারখানাগুলি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার বন্ধ করেনি বা জীবাশ্ম জ্বালানীর বিকল্প ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেনি যার ফলেই বায়ুমন্ডলে কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে তার স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেকগুন বেশি।

শুধু তাই নয় বিশ্ব–উষ্ণায়নের ভয়াবহ ফল দেখা সত্বেও এখনও অনেক দেশের রাষ্ট্রনেতারা বনাঞ্চলকে রক্ষা না করে তার ধ্বংসসাধনে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র উন্নয়নের স্বার্থে। অতিরিক্তহারে বন নিধন এবং দাবানলের দরুণ বনাঞ্চল পুড়ে যাওয়ার প্রভাবে গ্রীন হাউস গ্যাস গুলির পরিমাণ বায়ুমন্ডলে শুধুই বেড়েছে যার ভয়ংকর ফল 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব–উষ্ণায়ন' ।

কিন্তু এত কিছুর পরেও বিশ্বের উন্নত দেশগুলি বিশ্ব–জলবায়ুর পরিবর্তনের সমাধানের উপায় থাকা সত্ত্বেও সেগুলির বহুল প্রয়োগে নীরব। ফলস্বরূপ, পৃথিবী আমাদের একমাত্র বাসস্থান হয়ে চলেছে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর। ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে মানুষই এরকম এক প্রজাতি যে নিজের বাসস্থানকে ধ্বংস করে চলেছে । প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় দায়ী মানবসমাজকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা প্রকৃতির অন্য কোনো প্রজাতির নেই ঠিকই কিন্তু মানুষও তো প্রকৃতির একটি অংশ, তাই মানুষ যখন তার অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আঁচ পায় তখন প্রকৃত বিচক্ষণতাবোধ থেকে প্রকৃতিকে ধ্বংসকারী মানবসমাজকে প্রশ্ন করে মানুষই ।

সুইডিশ এক তরুনী, গ্রেটা থুনবার্গ শৈশব থেকেই প্রকৃতির সাথে নিজেকে সম্পর্কিত মনে করে প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । আর তার ফলেই প্রতিনিয়ত প্রকৃতির উপর, পৃথিবীর উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের খবর গ্রেটার হৃদয়কে ব্যাথিত করে। উপরন্তু প্রকৃতির উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের ফলে মানুষের জীবন যেভাবে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে, তাতে গ্রেটার মত বিশ্বের যে কোনো শিশুরই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ কল্পনা করে; একমাত্র বাসযোগ্য গ্রহ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কল্পনা করে গ্রেটার মন আঁতকে ওঠে। যখন সে বুঝতে পারে যে পৃথিবীতে প্রকৃতির অন্যান্য প্রজাতি এবং মানব প্রজাতির উপর নেমে আসা বিপর্যয়ের কারণ আসলে মানুষই, তখন সে প্রবীন সমাজকে প্রশ্ন করতে থাকে কেন এই

প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় মানুষ! যে ধ্বংসের কারণে তার মত বিশ্বের সমস্ত শিশুর, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে । একটি সুইডিশ সংবাদপত্র–এর উদ্যোগে হওয়া ২০১৮ সালের একটি রচনা লেখা প্রতিযোগীতায় গ্রেটা লেখে – "I want to feel safe. How can I feel safe when I know we are in the greatest crisis in human history ?"

সুইডেনের সংবাদপত্রে গ্রেটার লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর সেখানকার প্রবীনসমাজকে, যুবসমাজকে ভাবিয়ে তোলে । গ্রেটা যখন বুঝতে শিখলো যে প্রত্যেক বছর হয়ে চলা জাতিসংঘের জলবায়ু চুক্তি সম্মেলনের পরেও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে সেইভাবে চেষ্টা না করে শুধুমাত্র দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে চলেছে, তখন নিজেকে না থামিয়ে ২০১৮ সালের জলবায়ু চুক্তি সম্মেলনে মাত্র ১৫ বছর বয়সে অংশগ্রহন করে বিশ্বনেতাদের কাছে এক কঠিন বাস্তব প্রশ্ন করে বসে যার উত্তর সেদিন কেউ দিতে পারেনি । শুধু অবাক করেছে মানুষকে – এত পরিবেশ সচেতন মানুষ থাকা সত্ত্বেও কেউ কোনোদিন এতটা গভীরভাবে নিজের ক্ষোভ গোটা বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতাদের সামনে তুলে ধরতে পারেনি কেন ?

সেদিন বিশ্বনেতাদের সামনে ১৫ বছরের তরুনী গ্রেটা থুনবার্গ চোখের জলে নিজের ভেতরে ক্ষোভ থেকে প্রশ্ন করে –

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Yet I am one of the lucky ones. People are suflering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extirction, and all you can talk about is money and fairy tales of etemal economic growth. How dare you!"

বর্তমানে গ্রেটা থুনবার্গ একজন সক্রিয় পরিবেশকর্মী এবং গ্রেটার দেখানো পথেই তরুন যুবসমাজ তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ, নিজেদের একমাত্র বাসস্থান পৃথিবীকে বাঁচাতে মরিয়াভাবে আন্দোলন করে চলেছে।

Fig-2 : পৃথিবীকে বাঁচাতে আন্দোলনে মরিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা

গ্রেটা থুনবার্গের দেখানো পথকে বিশ্বের বড় বড় নেতা নেত্রীরা বর্তমানে সমর্থন করেছেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটের সমাধানে বিজ্ঞানীদের দেখানো পথকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে । বর্তমানে গ্রেটার দেখানো পথে বিশ্বের অনেক বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী সপ্তাহে শুক্রবার (Firdays for future) জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থায়ীভাবে সমাধানের উদ্দেশ্যে নিজেদের ক্লাস বন্ধ রেখে বিশ্বনেতাদের কাছে দাবী রেখে আন্দোলন করে চলেছে,

গ্রেটার মতোই নিজেদের জীবনযাত্রায় এনেছে আমূল পরিবর্তন – যতটা পারছে পৃথিবীর বুকে কার্বন নির্গমন কমানোর প্রচেষ্টায় তারা চেষ্টা করছে প্রেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসোলিন দ্বারা পরিচালিত যান–বাহনের ব্যবহার যতটা পারা যায় কমানোর পর্যাপ্ত গাছ লাগানোর , পরিবেশদূষণে দায়ী বস্তুকে ব্যবহার বন্ধ করা ; আর করবে নাই বা কেন ! নবীন সমাজ অন্তত এটা বুঝতে পেরেছে ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিট্রেশন (NASA) যতই ভিনগ্রহের খোঁজ দিক পৃথিবীর মত প্রাণের বাসযোগ্য অন্য কোনো দ্বিতীয় পৃথিবীর অস্তিত্ব অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু হয়। তাই সেই মানুষের এক ও একমাত্র বাসস্থান পৃথিবীকে বাঁচাতে নবীন প্রজন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নবীনসমাজের এইরকম পরিণত মস্তিষ্কের , সঠিক বিচক্ষণতাবোধের একের পর এক উদাহরণ প্রবীন সমাজকে অবাক করছে আর নিজেদের প্রকৃতির প্রতি ভূমিকা নিয়ে তাদের সামনে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলছে সাথে এক নতুন ভবিষ্যতের আলোও দেখতে পারছেন।

তাই শুধুমাত্র থুনবার্গ নয়, শুধুমাত্র বিশ্বের কিছু দেশের নবীন সমাজ নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রনেতা নেত্রীদের, শিল্পপতিদের যেমন বড় ভূমিকা আছে পৃথিবীর জলবায়ুর সংকটময় অবস্থার সমাধানে স্থায়ীভাবে পরিকল্পনা করার, ঠিক তেমনি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের সচেতন নাগরিকেরও ভূমিকা আছে প্রকৃতির ধ্বংসের ক্ষতিপূরণের। কারণ, মানবসভ্যতার বিকাশে, দেশের আর্থিক বিকাশের স্বার্থে মানুষেরই কার্যকলাপে আমাদের একমাত্র বাড়ি – একমাত্র প্রাণের বাসযোগ্য গ্রহ পৃথিবী আজ উত্তপ্ত ! বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট আজ বিশ্ববাসীর কাছে আসন্ন এক অতিমারী – যার সমাধান এখন থেকেই না করলে গোটা মানবসভ্যতার বিলীন হওয়ার সময় অরো এগিয়ে আসবে ।

বিজ্ঞানের দেখানো পথকে অনুসরণ করতে হবে প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের । জীবাশ্ম–জ্বালানী অত্যাধিক ব্যবহার যেখানে বায়ুমন্ডলে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে তথা গ্রীনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছে সেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরো কাজে লাগিয়ে জীবাশ্মজ্বালানীর বিকল্প শক্তিগুলিকে যেমন– সৌরশক্তি, জলশক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োমাসজনিত শক্তি যেগুলি চিরাচরিত শক্তিরূপে পরিচিত, তাদের ব্যবহার বেশি করে বাড়াতে হবে । এই বিকল্প শক্তিগুলিকে মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও বেশি করে বাড়াতে হবে। বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের ব্যবহার যেমন কমাতে পারে কার্বন নিঃসরণ ঠিক তেমনি কৃষিকাজে রাসায়নিক কীটনাশক, সার ব্যবহার না করে জৈবপদ্ধতিতে কৃষিকাজ দিতে পারে প্রত্যেকটি নাগরিককে সুস্থ জীবন এবং মাতৃ–ধরণীর ভূমিকেও রাখতে পারে সুস্থ ও সুফলা। কারণ মাটি সুস্থ থাকলে তবেই সেখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাবার উৎপাদন সম্ভব। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রনেতাদের শিল্পপতিদের বিশেষকরে উন্নতশীল রাষ্ট্রগুলিকে বুঝতে হবে শিল্পের বিকাশ, আর্থিক বিকাশেই মানবসভ্যতার উন্নয়নই শেষ কথা নয় । মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে যত্ন নিতে হবে প্রকৃতির ; যে প্রকৃতি একদিন মানুষেরই অবহেলায় রণমুর্তি ধারণ করে মানবসভ্যতাকেই বিলীন করে দিতে পারে । যে প্রকৃতির বিপর্যয়ের সামনে উন্নতমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ হয়ে পড়ে শিশুর মত অসহায়।

রাষ্ট্রগুলিকে দায়িত্ব নিতে হবে দাবানলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বনাঞ্চলকে আবার ফিরিয়ে আনা পর্যাপ্ত গাছ লাগানোর মাধ্যকে। যেখানে মানুষ নিজের জীবন যাত্রার উন্নয়নের স্বার্থে ধ্বংস করেছে প্রকৃতির প্রাণবায়ুদাতা উদ্ভিদকে । সেই পরিমাণ গাছ লাগিয়ে বায়ুমন্ডলকে করতে হবে বিশুদ্ধ। উদ্ভিদপ্রজাতিই একমাত্র প্রজাতি যা বায়ুমন্ডলের উষ্ণতার জন্য দায়ী কার্বনঘটিত গ্যাস কার্বনডাইঅক্সাইডকে শোষণ করে যেমন অন্য প্রজাতির খাদ্যের জোগান দেয় ঠিক তেমনি মানুষও বিনিময়ে পায় প্রাণবায়ু অক্সিজেন। পর্যাপ্ত বনাঞ্চল পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বেড়ে যাওয়া কার্বনডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে ফিরিয়ে দিতে পারে পৃথিবীর স্বাভাবিক গড় তাপমাত্রা। আর বিশ্বের জলবায়ু সংকটের যে সমস্যা গোটা বিশ্ববাসীকে চিন্তিত করে তুলেছে তার সমাধান মানুষেরই হাতে। একজন সাধারণ মানুষ অন্তত 'বৃক্ষরোপন' করেও এই বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটের সমাধানের জন্য অবদান রাখতে পারে। কারণ একটি বৃক্ষ যেমন মানুষের জীবনকে বাঁচাতে পারে

তেমনি বায়ুমন্ডল থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে করতে পারে পরিস্রুত ও শীতল । আর এই পরিবেশ সম্পর্কে, প্রকৃতির জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে – প্রবীন থেকে নবীন সমাজকে সচেতন করতে এগিয়ে আসতে হবে বিশ্বের পরিবেশ প্রেমী, পরিবেশ সচেতন, সচেতন শিক্ষাবিদদের। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক সুস্থ ও বাসযোগ্য পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিতে প্রবীনসমাজকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনি নবীন সমাজ যারা চঞ্চল, যারা নির্ভীক – প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে মানুষের একমাত্র বাড়ি পৃথিবীকে বাঁচাতে, পৃথিবীকে আবার সুজলা – সুফলা – শ্যামলায় পরিণত করতে ।

পৃথিবীরই সম্পদকে ব্যবহার করে মানুষ যেমন নিজের সভ্যতার উন্নয়নের অসাধ্য সাধন করে প্রকৃতির বর্তমান সংকটময় অবস্থা করেছে ঠিক তেমনভাবেই প্রকৃতিকে বাঁচাতে মানুষই পারবে। শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে পরিবর্তন করতে হবে। নোবেলশান্তি পুরষ্কারপ্রাপ্ত চোদ্দতম দলাইলামা তাই যথার্থই বলেছেন – "মনুষ্য প্রজাতিই একমাত্র প্রজাতি যে জানে কিভাবে পৃথিবীকে ধ্বংস করা যাবে। তবুও, এটাও সত্যি যে যদি আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকে তাহলে, তাঁকে বাচানোর ক্ষমতাও আমাদের আছে ।"

আর এটাই সত্যি যে জলবায়ু পরিবর্তনে সংকটের জন্য দায়ী মানুষই পারে এর সমাধান করতে। গ্লাসগোতে হওয়া জাতিসংঘের ছাব্বিশতম "জলবায়ুচুক্তি সম্মেলনে" বিশ্বের প্রায় দু'শোটি দেশের রাষ্ট্রনেতারা এবং তাদের প্রতিনিধিরা প্রায় দুসপ্তাহ ধরে জলবায়ু নিয়ে পর্যালোচনার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে যতটা সম্ভব জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার প্রত্যেকটি দেশে বন্ধ করতে হবে বিশেষ করে উন্নতমান দেশগুলিকে সব থেকে আগে তা বন্ধ করতে হবে । পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ আরও অনেক সক্রিয় নবীন প্রজন্মের অনবরত আন্দোলন, বিক্ষোভের দরুনই জাতিসঙ্ঘের এই সিদ্ধান্ত । যদিও গ্রেটা থুনবার্গ মনে করছে, এই COP26 তেও জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে শুধুমাত্র বাক্য ব্যয় হয়েছে কোনোরকম স্থায়ী সমাধান রাষ্ট্রনেতারা করেননি, তাই তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে যতদিন না কোনো স্থায়ী সমাধান জাতিসংঘ করতে পারে। শুধু গ্রেটা নয় , শুধু পরিবেশকর্মীরা নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট আসন্নপ্রায় – তাই আর দেবী না করে আমাদের সকলকেই হাতে হাত রেখে নিজেদের প্রকৃতির প্রতি অবদান রাখতে হবে। শুধুমাত্র নিজের দেশ, নিজের লোক, নিজের ঘর বলে ভাবার আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষেরই স্বার্থে আমাদেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে বিশ্বকে নিজের একমাত্র বাড়ি মনে করে পৃথিবীকে বাঁচানের জন্য নিজেদের অবদান রাখতে হবে – সেটি বৃক্ষ রোপণের দ্বারাই হোক অথবা নিজের জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন করেই হোক ।

নিজেদের প্রকৃতিরই একটি অংশ ভেবে , প্রকৃতিকে নিজের আত্মীয় মনে করে তার যত্ন নিতে হবে, পরিবেশকে সুস্থ রাখতে মানুষের যা যা করণীয় তার সবটাই করতে হবে আমাদের প্রিয় – আমাদের একমাত্র বাড়ি পৃথিবীকে সুন্দর, সুস্থ ও চিরকালীন করার লক্ষ্যে ।

কারণ, পৃথিবীকে তার জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটময় অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারলেই আমরা বাঁচব, আমাদের দেশ বাঁচবে, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থভাবে আবার বাঁচতে পারবে , হাঁসতে পারবে – গোটা মানবসভ্যতাই আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে আর সেই বহুরূপী মৌলটি 'কার্বন', একদিকে নতুন নতুন প্রাণসৃষ্টি করার আনন্দে মেতে থাকবে, অপরদিকে পরিমিত কার্বনডাইঅক্সাইড তৈরী করে পৃথিবীর গড় উষ্ণতাকেও স্বাভাবিক রেখে পৃথিবীকে প্রাণের বাসযোগ্য করে তুলবে ।

সবশেষে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে –

"If we pollute the air, water and soil that keep us alive and well, and destroy the biodiversity that allows natural syatems to function no amount of money will save us." - David Suzuki

রাষ্ট্র চেতনায় মা দুর্গা

ড. অঙ্কিতা মুখার্জী,
বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

'মা' এই ছোট্ট শব্দের কী অসামান্য ধারণ ক্ষমতা। এই শব্দটি আমরা উচ্চারণ করি কখনো সম্পর্কের সংরাগ মিশিয়ে, কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংরাগ মিশিয়ে, কখনো ভক্তিভাবাপন্ন হৃদয়ের আবেগ দিয়ে এবং কখনো নির্ব্যক্তিক স্বদেশ চেতনায় আসীন হয়ে। আবার জন্মদাত্রী মা ও আরাধ্য ঈশ্বরী মূর্তি কিংবা জন্মভূমির মাতৃরূপ কখনো কখনো মিলিত সত্ত্বায় মানস পটে ভেসে ওঠে। মানবজীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে আমাদের স্বদেশ মাতৃরূপেই বন্দিত। পৌরাণিক বা দুর্গা, লোকচেতনায় ও সাহিত্যে জন্মভূমির সঙ্গে একাত্ম। আসলে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে আমরা মা দুর্গা এবং স্বদেশ উভয়কেই অন্তরের পূজা নিবেদন করে থাকি। মা দুর্গাও দেশমাতৃকার অভিন্ন মাতৃসত্বা সাহিত্যিকদের লেখনী স্পর্শে আরও সঞ্জীবিত হয়ে মানবমনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা অভিভূত হয়েছি রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে মা দুর্গা যখন একাকার হয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মাতৃবন্দনাগীতিতে। তাই পৌরাণিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মা দুর্গার রূপগত ও দর্শনগত সাযুজ্যের স্বরূপ অনুধ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনার প্রেক্ষিতে মা দুর্গার স্বরূপ অনুধ্যানে আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়ে থাকে। কালিকাপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসরণে দেখা যায়, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। শাস্ত্র অনুযায়ী শরৎকালে দেবতারা নিদ্রমগ্ন থাকেন। এই সময়টি তাদের পূজার জন্য যথাযথ সময় নয় অথচ এই অকালেই মা দুর্গার পূজা করা হয়েছিল বলেই এই পূজা 'অকালবোধন' হিসেবে প্রচলিত। এই শারদীয়া দুর্গাপূজাই আবার বাঙালীর অন্যতম প্রধান উৎসব। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেকৃষ্ণকে দুর্গাপূজার প্রবর্তক বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম যুগে বৈকুণ্ঠের আদি-বৃন্দাবনের মহারাসমন্ডলে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন পরমাত্মা কৃষ্ণ। দ্বিতীয় দুর্গাপূজা করেছিলেন ব্রহ্মা এবং সেটি মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুরের ভয়ে। ত্রিপুর নামে এক অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিপদে পড়ে শিব তৃতীয় দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। দুর্বাসা মুনির অভিশাপে লক্ষ্মীকে হারিয়ে ইন্দ্র চতুর্থ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তারপর থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে মুনিঋষি, সিদ্ধপুরুষ, দেবতা ও মানুষেরা দুর্গাপূজা করে আসছেন। শাক্ত ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ দেবীভাগবত পুরাণে কথিত আছে যে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু পৃতিবীর শাসক হয়ে ক্ষীরোদসাগরের তীরে দুর্গার মাটির মূর্তি তৈরী করে পূজা করেছিলেন।২ শ্রীশ্রী চন্ডী অর্থাত মার্কন্ডেয় পুরাণের নির্বাচিত অংশে দুর্গাপূজার যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাতে দেবী দুর্গার পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তিই পূজিত হতে দেখা যায়। শাস্ত্রে 'দুর্গা' নামটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

'দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।'৩

অর্থাত দুর্গা নামের অক্ষরগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপনাশন ও আ-কার ভয় শত্রুনাশক। অর্থাৎ যিনি দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে, 'দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা' - অর্থাৎ দুর্গা নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিতা।৪ আবার শ্রীশ্রী চন্ডীতে বলা হয়েছে যে, এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগণ শক্তি সমূহমূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।৫

দুর্গাপূজার সময় মা দুর্গার বাহন সিংহকেও বিশেষভাবে পূজা করা হয় এবং সিংহ রজোগুণের এক প্রচন্ড শক্তির উচ্ছাসের প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দের মতে - 'সত্বগুণের অনুগত হলে সেই শক্তি লোকস্থিতির সহায়ক হয়ে ওঠে।... (সিংহ) আসুরিকতা ও পাশবিকতার উচ্ছেদ সাধনপূর্বক দেবীর লোকস্থিতিমূলক পূণ্য কর্মের সহায়কারী।'৬ বস্তুত সিংহ মানুষের পশুত্ববিজয়েরও প্রতীক। স্বামী প্রমেয়ানন্দের মতানুযায়ী - 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে পশু শক্তি। পুরুষকার ঔ সাধন ভজনের দ্বারা মানুষ যখন যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হয় তখন তার পশুভাব কেটে গিয়ে দেবভাব জাগ্রত হয়। আর তখনই সে প্রকৃত শরণাগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, সার্থক জীবনের অধিকারী হয়। দেবীর চরণতলে সিংহ সেই ভাবেরই প্রতীক।'৭

অন্যদিকে মহিষাসুর অসুর অর্থাৎ দেবদ্রোহী। তাই দেবীপ্রতিমায় দেবীর পদতলে দলিত এই অসুর হলেন 'সু' এবং 'কু' -এর মধ্যকার চিরকালীন দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের দ্যোতক। স্বামী প্রমেয়ানন্দ বলেছেন - 'সাধকের পক্ষে অসুর অবিদ্যা। বিদ্যারূপিণী মা অবিদ্যা বিনাশ করে মহামুক্তির বিধান করেন। সাধারণ মানুষের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ভীতি, আপদ-বিপদ - এ-সকলই আসুরিক শক্তির কার্য। পরমকরুণাময়ী মা নিরন্তর অসুর বিনাশ করে সন্তানের কল্যাণ বিধান করেছেন।'৮

গণেশ হলেন কার্যসিদ্ধির দেবতা। পুরাণ অনুযায়ী, সমস্ত দেবতার আগে গণেশের পুজা করতে হয়। স্বামী প্রমেয়ানন্দ জানিয়েছেন - 'গণশক্তি যেখানে ঐক্যবদ্ধ সেখানে কর্মের সকল প্রকার বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়। দেবাসুর-যুদ্ধে দেবতারা যতবারই ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসুরদের সঙ্গে লড়াই করেছেন ততবারই তাঁরা জয়ী হয়েছেন। গণেশের আর এক নাম বিঘ্নেশ, অর্থাৎ বিঘ্ননাশকারী। বিঘ্নেশ প্রসন্ন থাকলে সিদ্ধি নিশ্চিত।"৯ গণেশের বাহন হল মূষিক বা ইঁদুর। এই ইঁদুর মায়া ও অষ্টপাশ ছেদনের প্রতীক। ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব বলেছেন - 'জীবের কর্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মূষিক। প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্মফল বিদ্যমান থাকিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্মফল হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত।'১০

অন্যদিকে মা দুর্গার সঙ্গে আসেন মা লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী হলেন শ্রী, সমৃদ্ধি, বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতীক। শুধু ধন, ঐশ্বর্যই নয়, তিনি চরিত্রধনেরও প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন - 'ধন, জ্ঞান ও শীল - তিনেরই মহনীয় বিকাশ দেবী লক্ষ্মীর চরিত্রমাহাত্মে। সর্বাত্মক বিকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই তিন কমলা। কমল বা পদ্মের ন্যায়ই তিনি সুন্দরী, তদীয় নেত্রদ্বয় পদ্মের ন্যায় আয়ত। তাঁর শুভ করে প্রস্ফুটিত পদ্মকুসুম, পদ্মবনেই তাঁর বসতি।'১১ আবার মহানামব্রত ব্রহ্মচারী অন্যদিকে সমুদ্রমন্থনে সমুদ্ভূতা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তিতত্ত্বের অপর এক ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, - 'যাঁহারা বিচক্ষণ তাঁহারা ভূমি-প্রকৃতি কর্ষণ করিয়া শস্যধন আহরণ করেন, বন-প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া ধন আহরণ করেন। খনি প্রকৃতি খনন করিয়া স্বর্ণধন সংগ্রহ করেন। এই সকলই সাগরমন্থন। ... এই সকল সাগর-মন্থনে ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবির্ভাব।'১২ মা লক্ষ্মীর বাহন হল পেচক বা প্যাঁচা। এই বিশ্বাস মূলত লোকবিশ্বাস।১৩ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মতে - 'পেচক মুক্তিকামী সাধনকে বলে, সকলে যখন ঘুমায় তুমি আমার মতো জাগিয়া থাকো। আর সকলে যখন জাগ্রত তখন তুমি আমার মতো ঘুমাইতে শিখ, তবেই সাধনে সিদ্ধি। কৈবল্যধন লাভ। পরমার্থধনাভিলাষী সাধক পেঁচার মতো রাত্রি জাগিয়া সাধন করে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে থাকে।'১৪

মা দুর্গার কন্যা সরস্বতী, বাণীরূপিণী বাগদেবী এবং জ্ঞানশক্তির প্রতীক। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন - 'দেবীর হাতে পুস্তক ও বীণা। পুস্তক বেদ শব্দব্রহ্ম। বীণা সুরছন্দের প্রতীক নাদরহ্ম। শুদ্ধ সত্বগুণের মূর্তি, তাই সর্বশুক্লা। শ্বেতবর্ণটি প্রকাশাত্মক। সরস্বতী শুদ্ধ জ্ঞানময়ী প্রকাশস্বরূপা। জ্ঞানের সাধক হইতে হইলে সাধককে হইতে হইবে দেহে মনে প্রাণে শুভ্র-শুচি।'১৫ সরস্বতীর বাহন হংস পবিত্রতার প্রতীক এবং স্বামী নির্মলানন্দের মতে - 'সরস্বতী-ব্রহ্ম বিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্মী।'১৬ দেবী দুর্গার পরিবারের আরেক সদস্য দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বা কার্তিক এবং তিনি হলেন সৌন্দর্য ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক।

মা দুর্গার রূপমূর্তির এই পৌরাণিক ও লৌকিক অনুষঙ্গ ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেশ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে দুর্গার মাতৃসত্ত্বার স্বরূপগত সাযুজ্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে পারি। আমরা রামায়ণে প্রথম শ্রীরামকে বলতে শুনি - 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী' অর্থাৎ স্বর্গের চেয়েও গরিমা যুক্ত হলেন দেশমাতা। এর অর্থ দেশমাতা ঈশ্বর সমতুল্য পূজনীয়। ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমর দেখব বহিরাগত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় দেশমাতাকে দুর্গা রূপে কল্পনা করেছেন ভারতের অযুত মানব সম্প্রদায় এবং সম্রাটগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাজপুত এবং মারাঠারা বহিরাগত মোঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অনুপ্রেরণা লাভ করতেন জয় ভবানী ধ্বনি উচ্চারণ করে। ভবানী দেবী দুর্গার আরেক নাম। দেশমাতাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে যাবার আগে ভারতীয় সেনারা স্মরণ নিতেন দেবী দুর্গার। এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেবী দুর্গার উপাসনা করছেন, কারণ সনাতন ভারতের সংস্কৃতিতে রাষ্ট্রকে মাতৃশক্তি বা দেবী দুর্গা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। পরম বৈভব সম্পন্ন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বীরব্রত। আর দেবী দুর্গার আরাধনা ব্যতীত এই বীরব্রত লাভ করা সম্ভব নয়। তাই বারবার দেবী দুর্গার মধ্যেই পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাবনাকে পরিলক্ষিত করেছে ভারতবাসী।

আমাদের রাষ্ট্রগীতি অর্থাত বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'বন্দোমাতরম' - এ মাতৃভূমিকে মা সম্বোধন করে বন্দনা করা হয়েছে। ১৮৭০ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটি রচনা করেন এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস যুক্ত করেন এই সংগীতটিকে। 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীরা গানটি গেয়েছেন এবং মা দুর্গার সঙ্গে তারা দেশকে অভিন্নতায় প্রত্যক্ষ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই দেশমাতৃকা সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। তাঁর শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত রাতের শোভা অনির্বচনীয়। বনফুল তাঁর অঙ্গের

ভূষণ। তিনি সুহাসিনী, মধুরভাষিণী, সুখদাত্রী এবং বরদাত্রী। তাঁর সপ্তকোটি সন্তানের কণ্ঠনিনাদে গগন মুখরিত এবং সেই সন্তানদের হাতে রয়েছে তরবারী। তিনি অসীম বলশালিনী। বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশমাতৃকাকে বিদ্যা, ধর্ম ও প্রাণশক্তি স্বরূপে অনুভব করেছেন। রাষ্ট্র মাতা দেবী দুর্গা হলেন দশপ্রহরণধারিনী অর্থাৎ দশ হাতে তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন। তিনিই দেবী লক্ষ্মী, কমলা এবং বাণীবিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী। দেশমাতা হলেন শক্তি, সম্পদ এবং জ্ঞানের উৎস। দেশ রক্ষা করতে যেমন শস্ত্রের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সম্পদ এবং শাস্ত্র জ্ঞানের। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আমরা দেখি ব্রহ্মচারী সত্যানন্দ ঠাকুর মহেন্দ্রকে দেবী দুর্গার তিনটি রূপ দর্শন করিয়েছেন। এই তিনটি রূপ হল ভারতবর্ষের রূপ, যথা - 'মা যাহা ছিলেন, মা যাহা হইয়াছেন, মা যাহা হইবেন।' এই তিনটি রূপ হল যথাক্রমে দেশমাতৃকার অতীত রূপ অর্থাৎ মা জগদ্ধাত্রী, বর্তমান রূপ অর্থাৎ মা কালী এবং তার ভবিষ্যৎ রূপ অর্থাৎ মা দুর্গা। অতীতে জন্মভূমি দেশমাতৃকা ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ, তাই অতীতের ভারতমাতা দেবী জগদ্ধাত্রী। বর্তমানে অর্থাৎ ঋষি বঙ্কিমের সময়ে (উনিশ শতক) দেশমাতা পরাধীন, নগ্নিকা, রুধিরসিক্তা, কঙ্কালমালিনী, তাই মা কালী। আর ভবিষ্যতে তিনি দশ হাতে অস্ত্র সমন্বিত দশপ্রহরণধারিনী দুর্গা। এভাবেই রাষ্ট্রের অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যত -এর বর্ণনা দিতে গিয়ে দেবী দুর্গার তিনটি রূপ ব্যক্ত করেছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। অন্যদিকে দেবী দুর্গা সত্ত্বগুণের প্রতীক ও তাঁর বাহন হল বনের রাজা সিংহ। সিংহ রজঃ গুণের প্রতীক। দেশ পরিচালনার জন্য সত্ত্ব এবং রজঃ গুণের সমন্বয়ের প্রয়োজন অবশ্য। এই সিংহবাহিনী রাষ্ট্রমাতার প্রতিমা সত্ত্ব ও রজঃ গুণের সমন্বয়ের প্রতীক। তাই আমরা দেখি ১৯৩৭ খ্রীঃ পি.এস. রামচন্দ্র রাও ভারত মাতার যে ছবি অঙ্কণ করেন, সেখানে দেশমাতা দেবী দুর্গার ন্যায় সিংহবাহিনী। এর আগে ১৯০৫ খ্রীঃ অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর অঙ্কিত ভারতমাতার চিত্র ছিল জাতীয়তাবাদীদের কাছে অনুপ্রেরণাদায়ক। অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য রাষ্ট্র মাতাকে বৈষ্ণবী রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল অন্ন, বস্ত্র, রুদ্রাক্ষ, যা জ্ঞানের প্রতীক এবং তিনি বরাভয়দাত্রী। রাষ্ট্রমাতা আমাদের অন্ন, বস্ত্র, জ্ঞান দিয়ে প্রতিপালন করেন ঠিক যেমন ঈশ্বরী করে থাকেন, সন্তানকে সুরক্ষাও দান করেন। এই সুরক্ষার দিকটি আরো প্রাণময় হয়ে ওঠে পি.এস. রামচন্দ্র রাওয়ের সিংহ বাহিনী ভারতমাতার ছবিতে। আজও প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী সিংহবাহিনী ভারতমাতার প্রতিমাই দেশজুড়ে পূজিত হয়। ঋষি অরবিন্দের 'সাবিত্রী' কাব্যগ্রন্থতেও আমরা দেশমাতা রূপে দেবী দুর্গার কল্পনার অস্তিত্ব পেয়ে থাকি, যেখানে সাবিত্রী হলেন দেশমাতা দেবী দুর্গা। পন্ডিচেরিতে অখন্ড ভারতের মানচিত্র আর ভারত মাতার চিত্রপটের সম্মুখে বসেই ঋষি অরবিন্দকে ধ্যানমগ্ন হতে দেখা যায়। ১৯০১ খ্রীঃ বেলুড়মঠে শক্তি পূজা আরম্ভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রবন্ধে তিনি জাতির উন্নতির জন্য আদ্যা শক্তি রূপে দেশমাতাকে পূজার কথা বলেছিলেন। বর্তমানে আমরা যে দুর্গা প্রতিমার আরাধনা করি সেটি একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিমূর্তি। দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে যে দেবী সরস্বতীর, দেবী লক্ষ্মী, দেব সেনাপতি কার্তিক এবং শ্রীশ্রী গণপতি থাকেন, প্রচলিত বিশ্বাস অনুযয়ী তাঁরা হলেন দেবী দুর্গার সন্তানাদি। তবে এইরূপ ধারণা নেহাতই লৌকিক ধারণা। কিন্তু লৌকিক ধারণা হলেও এই উপাসনার মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার উপাসনাকে আমরা এক পরিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দনাতে পরিণত করেছি। দেবী সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতীক, দেবী লক্ষ্মী সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতীক, দেব সেনাপতি কার্তিক প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার এবং শ্রীশ্রী গণপতি সমবায়ের প্রতীক। রাষ্ট্রব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, সম্পদ এবং প্রতিরক্ষার যথাযথ সমবায় হিসেবে এই চারটি বিষয়েরই প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত এই চারটি বর্ণ যা শরীরের চার অঙ্গের মতো অপরিহার্য। বর্ণপ্রথা মানে উচ্চ - নীচ বিচার নয়, বৈদিক সমাজে এই চার বর্ণ ছিল একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্রমাতা দেবী দুর্গাও এই চার বর্ণের উপর নির্ভরশীল। এই চারজন দেব-দেবী মূলত চার বর্ণের প্রতীক হিসেবেই চিহ্নিত। জ্ঞান বিদ্যার দেবী সরস্বতী হলেন প্রথম বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ তথা বিদ্যা গুণের প্রতীক, শ্রীশ্রী কার্তিক ক্ষত্রিয় তথা শক্তি গুণের প্রতীক, সম্পদের দেবী লক্ষ্মী বৈশ্য তথা বাণিজ্য গুণের প্রতীক এবং শ্রী শ্রী গণপতি হলেন শুদ্র তথা শ্রম গুণের প্রতীক। ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যর সম্পদ আর শুদ্রের শ্রম একত্রিত হলে তবেই কিন্তু রাষ্ট্রমাতা বৈভব সম্পন্ন হতে পারেন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে দেবী দুর্গা ও তাঁর পরিবার একত্রে হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক। মহিষাসুর রূপী দুষ্টের দমন করে দশপ্রহরণধারিণী রাষ্ট্রমাতা সেটাই করে থাকেন। আবার দুর্গা সম্পর্কে শ্রীশ্রী চন্ডী তে বলা হয়েছে যে দেবীর দশ হাতের অস্ত্র দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। দেশমাতা বা ভারত মাতার শক্তিও ঠিক তেমনই নাগরিকদের সম্মিলিত শক্তিতে সমৃদ্ধ। রাষ্ট্র যেমন সমসংস্কৃতি ও সমভাবাপন্ন মানুষদের সম্মিলিত শক্তি, তেমনই দেবী দুর্গা হলেন সংগঠিত দেবগরের সম্মিলিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। তাই যথার্থই দেবী দুর্গা হলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপূর্ণ রূপ। দেবী দুর্গার আরাধনার অর্থ রাষ্ট্রেরই আরাধনা। রাষ্ট্রের ভাবনাতে এভাবেই একাকার হয়ে যায় স্বদেশ, স্বধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা।

তথ্যসূত্র ঃ-

১) প্রবন্ধ শব্দাঞ্জলিতে দুর্গাপূজা, হরিপদ ভৌমিক, নতুন বাংলার মুখ পত্রিকা, আশ্বিন ১৪১৪, অক্টোবর ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৬৩
২) হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় খন্ড, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা ২২৭
৩) শব্দকল্পদ্রুম ৩, ১৬৬৬৬, পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৪
৪) শ্রীশ্রী চন্ডী ২, ৫১, পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৭
৫) দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্মলানন্দ, প্রণব মঠ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪
৬) পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫
৭) পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৫
৮) মহিষাসুর, সঞ্জয় ভুঁইয়া, বর্তমান পত্রিকা (বর্তমান রবিবার), ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮
৯) সাধন-সমর, ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব, সাধন-সমর কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৫-৭৬
১০) দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্মলানন্দ, প্রণব মঠ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২৫
১১) মা দুর্গার কাঠামো, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৬
১২) পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৬
১৩) মা দুর্গার কাঠামো, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭
১৪) মা দুর্গার কাঠামো, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১১
১৫) সাধন-সমর, ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব, সাধন-সমর কার্যালয়, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৬
১৬) পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৯

সহায়ক গ্রন্থ ঃ-

১) প্রবন্ধ শব্দাঞ্জলিতে দুর্গাপূজা, হরিপদ ভৌমিক, নতুন বাংলার মুখ পত্রিকা, অক্টোবর ২০০৭
২) পূজা-বিজ্ঞান, স্বামী প্রমেয়ানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯
৩) সাধন-সমর, ব্রহ্মর্ষি শ্রীসত্যদেব, সাধন-সমর কার্যালয়, কলকাতা
৪) হিন্দুদের দেবদেবী, তৃতীয় খন্ড, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ
৫) মা দুর্গার কাঠামো, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহাউদ্ধারণ মঠ, কলকাতা
৬) দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, স্বামী নির্মলানন্দ, প্রণব মঠ, কলকাতা

উপেক্ষিতা

ড. সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

পশ্চিম কামরূপের গোয়ালপাড়া জেলার পর্বত জোয়ারের জমিদার রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী ও প্রাণেশ্বরী চৌধুরীর তিন কন্যা। তাঁদের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা বৃন্দেশ্বরী দেবীর বিবাহ স্থির হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ ১২৪৭ বঙ্গাব্দের ২৭ ফাল্গুন একই দিনে মহারাজা কামেশ্বরী দেবী ও বৃন্দেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহ হয়েছিল রাজবাড়ীতে প্রথামতো পাত্রী তুলে এনে। কামেশ্বরী দেবী বৃন্দেশ্বরী দেবী অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। কামেশ্বরী দেবীকে বলা হত "ডাঙ্গর আই" আর বৃন্দেশ্বরী দেবীকে বলা হত "বড় আই"। শ্যামবর্ণা মধ্যম আকৃতির বৃন্দেশ্বরী দেবী সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কামেশ্বরী দেবীর সমতুল্য ছিলেন না, কিন্তু কোচবিহার রাজপরিবারে সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে তাঁর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কোচ রাজবংশে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ সর্বাধিক সময় রাজত্ব করেছেন (৫৬ বছর)। তাঁর সময়েও সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ধারা অব্যাহত ছিল। রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ, পুরাণ, ভাগবতের অনুবাদের পাশাপাশি কালিদাসের "ঋতুসংহার" কাব্যের ভাবানুবাদ, উপকথা, পদ্য ছন্দে হিতোপদেশের গল্পগুলোর ভাবানুবাদ, শাক্তগীতি, সঙ্গীতশঙ্কর এবং রাজানুকূল্যের বাইরে জনপ্রিয় "গোসানীমঙ্গল" কাব্য রচিত হয়েছিল। যদিও মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল নিষ্কন্টক ছিল না। রাজনৈতিক উত্থান পতন, কলহ, চক্রান্ত, দুর্যোগ, দুর্বিপাকের মধ্যে থেকেও মহারাজা নবধারায় শক্তিসাধনা এবং ১৭৯টির মতো শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে আমাদের বিস্মিত করেছেন। শেষ বয়সে মহারাজা সম্পূর্ণরূপে কালী সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। অবশেষে রাজকুমার শিবেন্দ্র নারায়ণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে কাশীবাসী হন। কাশীতে ১৮৩৯ খ্রীঃ মহারাজার মৃত্যু হয়।

মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর ৪৩ বছর বয়সে মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৯৪০ খ্রীঃ দোল পূর্ণিমার দিন তিনি কামেশ্বরী দেবী ও বৃন্দেশ্বরী দেবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বেশ পরিণত বয়সেই মহারাজার বিবাহ হয়েছিল। বৃন্দেশ্বরী দেবী যখন রাজপরিবারের বধূ হয়ে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৯–১০ বছর। অর্থাৎ দুজনের বয়সের ব্যবধান ছিল ৩২–৩৩ বছরের মতো। এই বিবাহ যথেষ্ট জাঁকজমকের সাথে হয়েছিল। বিবাহ উপলক্ষ্যে কলকাতার গভর্ণর জেনারেল ও উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়দের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। গৌহাটিতে নিযুক্ত ব্রিটিশ এজেন্ট মিঃ জেনকিন্স কোচবিহারে উপস্থিত হন এবং কিছুদিন অবস্থান করে গৌহাটিতে ফিরে যান।

পিতা হরেন্দ্র নারায়ণের মানসিকতার উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ। মহারাজা ছিলেন শিক্ষিত, কর্মদক্ষ, বিজ্ঞ, সাহিত্য রসিক ও সদাশয়। সুশাসক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। জয়নাথ মুন্সী "রাজোপাখ্যান" গ্রন্থে লিখেছেন – "মহারাজ সদাচার সম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, দাতা, জ্ঞানী, দেবদ্বিজানুরক্ত, শাক্তশিরোমণি ও অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অসীম গাম্ভীর্য, ঔদার্য, সত্যসন্ধিৎসা, ক্ষিপ্রকারিতা, সৎকর্মানুরাগ, নীতিকুশলতা, গুণগ্রাহিতা, স্থিরপ্রতিজ্ঞা প্রভৃতি অসাধারণ গুণরাশির বর্ণনা আমার মত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।" স্বল্প আট বৎসরের রাজত্বকালে তিনি শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সহ নানাবিধ প্রজাহিতকর কর্মে নিজেকে লিপ্ত রাখেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রচিত হয় "মার্কন্ডেয় চন্ডী", "শিবপুরাণ", "রাজবংশাবলী"। মহারাজা নিজেও অনেক

শাক্তপদগীতি রচনা করেছেন। শিবেন্দ্র নারায়ণের রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও আন্তরিকতা। তাঁর গানের ভাষা সুন্দর ও মার্জিত। একটি পদ এখানে উল্লেখ করলাম –

"আমি তারা তারা তারা তারা হারা হৈলাম
বিষম বিষয়ে ভুইলা সকল খোওয়াইলাম্
জঠর যন্ত্রণা যত দিয়াছ মা কত শত
এ জনম বৃথা গেল তবু না পাইলাম।
নানা দুঃখে গেল দিন পাপে তনু হৈল ক্ষীণ
শ্রী শিবেন্দ্র ভূপে কয় মন পদে না মজিলাম্।"

মহারাজার দত্তক পুত্র করীন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হলে মহারাজ চতুর্থ ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র নারায়ণ কুমারের পুত্র নরেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহারাজা ব্রজেন্দ্র নারায়ণের উপর রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দিয়ে শিশুপুত্র, রাণীদ্বয় ও দাসদাসীসহ বারাণসী ধামে তীর্থ করতে যান। সেখানে ১৮৪৭ খ্রীঃ মহারাজার প্রয়াণ ঘটলে বারাণসীতেই শিশু নরেন্দ্র নারায়ণের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তখন মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণের বয়স মাত্র ৬ বৎসর। কোচবিহারে ফিরে এসে রাজ্যের দেওয়ান, কালীচন্দ্র লাহিড়ীর সাথে কামেশ্বরী দেবী ও বৃন্দেশ্বরী দেবী পরামর্শ করে নরেন্দ্র নারায়ণকে শিক্ষালাভের জন্য কৃষ্ণনগরে প্রেরণ করেন। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ মেধাবী ছিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি শাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ হতে তিনি কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউসনে পড়তে যান। রাজবংশে মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণই প্রথম ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ১৮৫৯ খ্রীঃ নরেন্দ্র নারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হলে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৮৬০ খ্রীঃ গভর্ণমেন্ট "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। সে সময়ে রাজ অন্তপুরে বৃন্দেশ্বরী দেবী সর্বাপেক্ষা শিক্ষিতা ছিলেন। শৈশবে পিতৃগৃহে পড়াশুনার সুযোগ ঘটেছিল। বাংলা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অংক পাঠে জ্ঞান জন্মেছিল এবং কোচবিহার রাজপরিবারে যখন বধূ হয়ে এলেন মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণ তাঁর পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেন। নিঃসন্তান অবস্থায় যখন তিনি বিধবা হন তখন তার বয়স ১৭–১৮ বৎসর। মহারাণী বৃন্দেশ্বরী পদ্যে আত্মজীবনের আধারে "বেহারোদন্ত" নামে একটি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। কোচবিহার রাজ দরবারে মহিলাদের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। ভণিতা বিচারে মনে হয় গ্রন্থটির রচনাকাল ১৮৫৯ খ্রীঃ। গ্রন্থটি ঐ বৎসরেই কাকিনা থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের কাব্যে ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ বৃন্দেশ্বরী দেবী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলো রাসসুন্দরী দেবীর "আমার জীবন" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ। অথচ তারও পূর্বে বৃন্দেশ্বরী দেবীর "বেহারোদন্ত" আত্মজীবনীর আধারে পরিবেশিত ঐতিহাসিক গ্রন্থটির নাম বাঙালী শিক্ষিত সমাজের মুষ্টিমেয় জন জানে।

মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর বিষাদ, হতাশাময় জীবন যন্ত্রণা নিয়েই কাব্য রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন মহারাণী। দুই রাণী মিলে শিশুপুত্রের লালন পালন করেছেন যেমন তেমনি রাজকার্যও পরিচালনা করেছেন। বইটিতে কোচ রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বৃন্দেশ্বরী দেবীর সমসাময়িক অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। পারিবারিক কথা বিস্তৃত আকারে পরিবেশিত হয়েছে। বিয়ে, বিয়ের রীতিনীতি, অলংকার ব্যবহার, উৎসব আয়োজন, মহারাজার শারীরিক অবস্থা, দেশের অবস্থা, অমঙ্গল আশঙ্কা, মহারাজের অসুস্থতা ও মৃত্যু, শ্রাদ্ধ কর্ম, নরেন্দ্রনারায়ণের সিংহাসন আরোহন, শিক্ষা, দেশশাসন, শিক্ষালাভের জন্য নরেন্দ্রনারায়ণের অন্যত্র যাবার বিষয়ে মাতৃহৃদয়ের বিলাপ দিয়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। পয়ার, ত্রিপদী, মল্লঝাঁপ ছন্দের ব্যবহার করেছেন। গণেশ, মহামায়া ও কালীবন্দনা দিয়ে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। কবি বৃন্দেশ্বরী অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বক্তব্য বিষয় প্রকাশে। দীর্ঘ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত করণে তার প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। স্বামীর নাম উল্লেখের দ্বিধা জড়তা আধুনিক মনস্ক রাণীর মধ্যে আমরা দেখতে পাইনি।

"কার্ত্তিক হইতে দেখি মনোহর রূপ।
শিবেন্দ্র নারায়ণ নাম রাখিলেন ভূপ।।

নিজের আত্মপরিচয় যেভাবে দিয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে কামেশ্বরী দেবীরও পরিচয় দিয়েছেন।

চাপাগড় গ্রামে ধাম, তাহে বজ্রধর নাম,
সর্বগুণান্বিত সুপন্ডিত।
ইষ্ট নিষ্ট মিষ্টভাষী কোন দোষে নহে দোষী,
ধনরত্ন যশেতে পূর্ণিত।
তাঁহার কুমারী হন, ব্যক্ত আছে ত্রিভূবন
যার নাম শ্রীশ্রী কামেশ্বরী।

মহারাজার মৃত্যুজনিত অকাল বৈধব্য বৃন্দেশ্বরী দেবীকে মেনে নিতে হয়েছিল। কত আর বয়স তখন? ১৭ – ১৮। শোক কাটিয়ে উঠতে চেয়েছেন রাণী গীতার বিখ্যাত শ্লোককে স্মরণ করে।

"সংসারের ধর্ম হয় জনম মরণ।
জন্মিলেই মৃত্যু হয় না হয় বারণ।।
সেই মৃত্যু কেবল দেহের মাত্র হয়।
জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ জীবের কভু নয়।।
যেন ছিন্ন ত্যাজি পরে নূতন বসন।
তেন পূর্ব্ব দেহ ছাড়ি নূতনে গমন।।
সেই দেহ অতি তুচ্ছ ক্ষণ ভঙ্গ তায়।
তাহার বিয়োগে শোক শোভা নাহি পায়।।"

কাশীধামেই মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদন হলে সেখান থেকে ভগ্নমনোরথ সবাই কোচবিহার এসে পৌছান। আশা করা হয়েছিল শিবেন্দ্র নারায়ণের ভ্রাতা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্য পরিচালনা করবেন, কিন্তু উদাসী ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্য্যে মন না দিয়ে যাগযজ্ঞ ধ্যানে, কালী সাধনায় মগ্ন থাকলেন। কবি বৃন্দেশ্বরী লিখেছেন —

"দুষ্টবর্গ যারা, কাল পেয়ে তারা,
করে তাড়াতাড়ি তারা।
ছিল যত ধন, করিল হরণ,
কি করি রমণী মোরা।।
সচিব যাহারা দ্বন্দ্বে মত্ত তাঁরা,
রাজ্যদিক নাহি চায়।
প্রজার সর্বস্ব, হরে সব দস্যু
বিচার কে করে তায়।।"

শেষ পর্যন্ত দুই মহারাণী রাজ্যের হাল ধরেন। মহারাণীদের যত্নে মহারাজাকে বাংলা শিশুবোধ, সংস্কৃত ও ফার্সী শিক্ষা প্রদান চলছিল। কিন্তু মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছে ছিল নরেন্দ্রনারায়ণ উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হোক। মহারাজার ইচ্ছেকে রূপ দিতে গভর্ণর জেনারেল এজেন্ট পাঠালেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ ৪ জুলাই অধ্যক্ষ রচফোর্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে মহারাজাকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হল। এই সময় মহারাজার বয়স ছিল ১০ বৎসর। কৃষ্ণনগরের চার বৎসর শিক্ষালাভের পর কলকাতা ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করানো হল। তারপর হিন্দুস্কুল ও ডভটন কলেজে ভর্তি

করানো হল। ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত কলকাতায় থেকে মহারাজা নীতিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিত্রকলা চর্চা, অশ্বারোহণ, বন্দুক চালানো, ব্যায়ামে শিক্ষালাভ করলেন। কোচবিহার রাজপ্রাসাদ থেকে মহারাণীদের নয়নের মণি নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না।

"পূর্ণবাদী হোয়ে বিধি দুর্ঘট ঘটায়।
শোকনীরে একেবারে সবারে ভাসায়।।
ইংরেজী শিক্ষার জন্য করিয়া উল্লাস।
রাজারে লইতে তারা করিলেক আশ।।
মধুমাসে আজেন্ট হইল উপনীত।
মন্ত্রীরে ডাকিয়া কহে বচন দুর্ণীত।।
বজ্রাঘাত সব বাক্য শুনি মন্ত্রিবর।
নেত্রনীরে ভাসি আসি কহিল সত্বর।।
তত্ত্বে উনমত্ত হয়ে যত রাণীগণ।
অচৈতন্য ধরাসয়ে করয়ে শয়ন।।
... ...
অক্রূর যেমন কৃষ্ণচন্দ্রে হরি নিল।
প্রাণাধিক সেই মত আজেন্ট করিল।।"

সন্তানের অদর্শন জনিত বিলাপ এখানে মাতৃহৃদয়ের বেদনাকে অতলস্পর্শী করেছে। রাজার অবর্তমানে অমাত্যবর্গের স্বেচ্ছাচারিতায় রাজ্যের প্রজাদের দুরবস্থা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কথা তুলে ধরেছেন কবি বৃন্দেশ্বরী। খবর পেয়ে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি নিয়ে মহারাজা দেশে এলেন। রাজ্যে আনন্দের বার্তা বয়ে গেল। আর জননীগণ —

"রাজার জননীগণে দেখি নরবরে।
গাবী যেন বৎস দেখি চিরদিন পরে।।"

ঐ বছরই মহাধূমধাম করে সাবালক মহারাজার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হল। রাজমাতা কামেশ্বরী দেবীর পছন্দে নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে মহারাজার বিবাহ হল। পুনরায় মহারাজা বিদ্যালাভের জন্য রাজ্য ছেড়ে যাবার বাসনা ব্যক্ত করলে রাজমাতাগণ দুঃখ পেলেন, মন্ত্রীগণ মাথা হেঁট করে রইলেন। এখানে দুঃখের দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন বৃন্দেশ্বরী দেবী। বিদ্যানুরাগী মহারাজা তাতেও ক্ষান্ত হলেন না, পুত্র অদর্শনজনিত শোক নিয়ে কাব্য সমাপ্ত হলো।

"মনের বিকার, ক্ষান্ত নাই আর,
বৃথা দিন চলি যায়।
শ্রীবৃন্দেশ্বরীর যেন এ শরীর,
লিপ্ত হয় রাঙা পায়।"

নৃপেন্দ্রনাথ পাল তার "বিষয় কোচবিহার" গ্রন্থে লিখেছেন – "বৃন্দেশ্বরী রচিত ইতিহাসের গুরুত্ব এখানেই, যে রাজঅন্তঃপুরবাসিনী হয়েও সাধারণ কাব্য বা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস লেখার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল কলম তুলে নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্য দরবারে তাঁর স্থান স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে কবিতার ছন্দে ইতিহাস রচনায় আর কোন মহিলা ঐতিহাসিক আছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। যদি তিনিই প্রথম হন তবে তাঁকে এবং তাঁর রচিত ইতিহাসকে আত্মজীবনীই ধরে নেই তবে একথা স্বীকার করতেই হয় কাব্যের মধ্য দিয়ে আত্মজীবনী রচনার প্রচেষ্টা বাংলায় তিনিই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন।" গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের ৬৫ বছর পর মহারাণী সুনীতি দেবীর

তৃতীয় পুত্র কুমার ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী রাণী নিরুপমা দেবী কর্তৃক পুণঃমুদ্রিত হয়।

উত্তরবঙ্গের প্রথম নামী যে স্কুলটি জেনকিন্স স্কুল নামে সুপরিচিত তার প্রতিষ্ঠালগ্নে মহারাণী বৃন্দেশ্বরীর অবদান অনস্বীকার্য। মহারাণী অনুভব করেছিলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার মতো শিক্ষালয় কোচবিহার রাজ্যে নেই। শিক্ষা লাভের জন্য রাজকুমারদের রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে। মহারাজের পুত্র রাজকুমার সে সুযোগ পেলেও রাজপরিবারের অন্যান্য কুমারগণের রাজগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। তাদের কথা চিন্তা করে ১৮৫৭ খ্রীঃ একক প্রচেষ্টায় রাজ্যের প্রথম বাংলা ভাষার বিদ্যালয়টি তিনি স্থাপন করেন। এই বঙ্গ বিদ্যালয়টির মাধ্যমেই কোচবিহার রাজ্যের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গোড়াপত্তন ঘটে। কুমার রঙ্গিলনারায়ণ সহ আরো ছয় সাত জন রাজজ্ঞাতি বালকেরা এখানে পঠন পাঠন শুরু করেন। প্রথম দু বছর স্কুলটি ভার্নাকুলার স্কুল বা স্থানীয়ভাবে বাংলা মাধ্যম স্কুল হিসেবে থেকে যায়। ঐ সময়ে দু'জন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম বৎসরেই ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ হল এবং দ্বিতীয় বৎসরে তা চল্লিশ পার হয়ে গেল। মুন্সী জয়নাথ ঘোষের পুত্র রামচন্দ্র ঘোষ ছাত্রদের স্বেচ্ছায় পড়াতেন ও পড়ার আগ্রহ যোগাতেন এবং মাঝে মাঝে ইংরেজী বর্ণমালা শেখানোর কাজটিও করতেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ অর্থাৎ স্কুলের তৃতীয় বৎসর বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় ও ইংরেজী ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই স্কুলটি ছিল মহারাণীর প্রাণপ্রতিম। স্কুল পরিচালনা, শিক্ষক নিয়োগ সবই মহারাণী অন্তঃপুরে বসে করতেন। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করার পরই স্কুল পরিচালনার বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনের একটি দপ্তরের উপর ন্যস্ত করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ বৃন্দেশ্বরী দেবীর ঐকান্তিক আগ্রহের স্কুলটির নামকরণ করলেন – জেনকিন্স স্কুল।

এখানে মেজর জেনকিন্স সম্পর্কে কিছু না বললে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। ১৭৯৩ সালে ধর্মযাজক পিতার গৃহে জেনকিন্সের জন্ম। ১৮১০ খ্রীঃ তিনি ভারতে আসেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে অল্পকাল মধ্যেই প্রশাসনিক দক্ষতার ফলে বহু দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মেজর জেনারেলের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। গৌহাটি ছিল তার কর্মস্থল। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের শাসনকালেও বহু প্রশাসনিক জটিল সমস্যার সমাধান করেছিলেন। মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের সময়ে রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, ট্রেজারির সংস্কার, সীমান্ত অঞ্চলের ফাঁকা জমিতে চাষাবাদের প্রচলন করে রাজ্যের প্রশাসন ও অর্থনীতির উন্নতি করেছিলেন।

১৮৩৪ খ্রীঃ থেকে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেলের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এজেন্ট ও কোচবিহার রাজ্যের কমিশনার নিযুক্ত হয়ে নানা জনহিতকর কর্ম করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব – ১৯৪৯ খ্রীঃ ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। দীর্ঘ ২৭–২৮ বৎসর ব্রিটিশ সরকার ও কোচবিহার রাজ্য সরকারের সাথে জেনকিন্সের প্রচুর চিঠি পত্রের আদান প্রদান হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীঃ ২৮ আগস্ট ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কোচ রাজবংশের দীর্ঘকালীন শাসনে বৃন্দেশ্বরী দেবীর মত গুণী রাণী বিরল। কতখানি মেধা থাকলে পদ্যে ইতিহাস লেখা যেতে পারে তাও ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তা অকল্পনীয়। শিক্ষিত সমাজে, বাংলার সাহিত্যিক মহলে, ইতিহাসে যতখানি তাঁর স্থান পাওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পাননি। বয়স্ক গুণী স্বামীর সাহচর্যও তাঁর ভাগ্যে বেশি দিন জোটেনি। ছিলেন নিঃসন্তান। "নরেন্দ্রনারায়ণ মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবীর দত্তক পুত্র" তাই পুত্রকেও একান্ত করে পাননি। নিজে হাতে গড়া শিক্ষালয়টিও মেজর জেনকিন্সের নামে নামকরণ করা হল। পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর আর কোনও ভূমিকাই রইল না। পরবর্তীকালে আধুনিকতার আবহাওয়ায় শিক্ষার জোয়ারে কোচবিহারে কত শিক্ষালয়ই না প্রতিষ্ঠিত হল, তাঁর নাম কেউ মনেও করলো না। বৃন্দেশ্বরী দেবীর নামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলে পাঠকবর্গ আমায় ক্ষমা করবেন। প্রায় ৪৫ বৎসর বয়সে ১৮৭৬ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। তার পূর্বে পুত্র মহারাজা

নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুও তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ মাত্র ২২ বৎসর বয়সে মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু ঘটে। রাজপরিবারের সুখ শান্তি মুহূর্তে মিলিয়ে যায়, শুরু হয় ক্ষমতা দখলের অশুভ লড়াই। দীর্ঘ বৈধব্য জীবন নিয়ে সব কিছুর সাক্ষী থেকেছেন রাণী। "বেহারোদন্তে"র উদ্ধৃতি দিয়ে সমাপ্তি টানছি।

"পর্ব্বত যোয়ারে দ্বার রাজেন্দ্র নারাণ বর
ধনেশ্বর জিনি ধনপতি।
যশে সর্ব্বদেশ পূর্ণ সবে করে ধন্য ধন্য,
শিষ্ট–শান্ত ধর্মে মতিগতি।।

... ...

তাঁহার নন্দিনী হই জানিনা কো দুঃখ বই,
কারে কই কৈয়ে কিবা ফল।।
জন্ম জন্মান্তরে কত, পাপ করি শত শত
শোধ তার বিধি ভাল দিল।।"

তথ্যসূত্র ঃ–

১। কোচবিহারের ইতিহাস – হেমন্ত কুমার রায় বর্মা
২। ইতিকথায় কোচবিহার – ড. নৃপেন্দ্র নাথ পাল
৩। আত্মকথনে কোচবিহার মহারাণী বৃন্দেশ্বরী ও জেনকিন্স স্কুল – মহেন্দ্র দেবনাথ
৪। কোচবিহার রাজবাড়ির অন্দরমহল – অরুণকুমার শীলশর্মা
৫। কোচবিহার রাজ জ্ঞানকোষ – অভিজিৎ রায়

পদ্মশ্রী ধর্মনারায়ণ বর্মা

দ্বিজেন্দ্র নাথ সিংহ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

ভাওয়াইয়ার আতুড়ঘর তুফানগঞ্জ, ধর্মনারায়ণ বর্মার জন্ম ও কর্মভূমি। পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষখ্যাত নদীমাতৃক দেশ রূপে। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের মধ্যে সর্বাধিক পাহাড়ি নদী বয়ে চলে এই মহকুমায়। তোর্সা, ঘরঘরিয়া, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক, সংকোশ প্রভৃতি নদীগুলির 'ভাওয়া' অর্থাৎ গোচারণ ভূমির সম্পদ ভাওয়াইয়া সংগীত আজ উত্তরবঙ্গের গন্ডি ছাড়িয়ে গোটা বিশ্বে সমাদৃত। টগর অধিকারী, সুরেন বসুনীয়া, আব্বাস উদ্দীন, নায়েব আলী টেপু এই মহকুমায় জন্মগ্রহণ করে ভাওয়াইয়া সংগীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। সংগীতের এই ভূমিতেই ইতিহাসের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ বিশ্ববীর চিলারায়ের গড় বর্তমান। প্রকৃতি ইতিহাস ও সংগীতের মূল ধারার বাইরে ধর্মনারায়ণ বর্মার শিক্ষা বিস্তার, ইতিহাস চর্চা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হাত ধরে ভাষা সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরাই আলোচ্য নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাজন্য শাসিত কুচবেহার রাজ্যের তুফানগঞ্জ পরগণার হরিপুর মৌজার পুণ্যির পাড়ে তাঁর জন্ম এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। পিতা দেবেশ্বর বর্মা ও মাতা মান্দল বর্মার এক কন্যা ও পুত্রের মধ্যে তিনি বয়কনিষ্ঠ ছিলেন। পুণ্যির পাড়ে সেই সময় কুচবিহার ও নিম্ন আসামের ক্ষত্রিয় মিলন উৎসবের পবিত্র স্থান ছিল। দেবেশ্বর বাবু নিজে পুণ্যির পাড় ক্ষত্রিয় মিলন উৎসব সমিতির কর্মকর্তা ছিলেন। মনে প্রাণের পঞ্চানণ অনুরাগী ছিলেন দেবেশ্বর বাবু এবং তিনি সহযোগী কয়েকজনকে নিয়ে পঞ্চাননের ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিতে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করেছেন (স্মৃতিকথা)। দেবেশ্বরবাবু নিজে কিছুকাল প্রাইমারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার মৃত্যু হয় ১৯৩৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। একই বৎসরের ১০ই নভেম্বর, ধর্মনারায়ণ বর্মা জন্মগ্রহণ করেন (মতান্তরে ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৩ সাল, ঠিকুজি কোষ্ঠি গত)। শৈশবে বারকোদালী গ্রামের নগেন পন্ডিতের কাছে শিক্ষারম্ভ। পরবর্তীতে বারকোদালী প্রাইমারী স্কুল পাশের পর ১৯৪৪ সালে তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুলে IV শ্রেণীতে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে ধর্মবাবুর পিতা দেবেশ্বর বাবু পরলোক গমন করেন। মায়ের অভিভাবকত্বে পরবর্তী পড়াশুনা করে ১৯৫১ সালে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। পরবর্তীতে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ. এবং বি.এ. পাশ করে ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ. ভর্তি হয়ে ১৯৫৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এ. পাশ করেন।

এম.এ. পাশ করে ঐ বছরেই কলিকাতার মেট্রোপলিটন (মেইন) উচ্চতর বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ডঃ কৃষ্ণ গোপাল গোস্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকে ঐ স্কুলে চাকরি করতে অনুরোধ করেছিলেন বলে লেখক 'স্মৃতিকথা' য় তুলে ধরেছেন। মায়ের আদেশে তুফানগঞ্জে ফিরে সেই বছরেই তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. উচ্চতর বিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সহ শিক্ষক রূপে চাকরিতে যোগ দেন এবং পরবর্তী প্রায় ৩৬ বৎসরকাল উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে ১৯৯৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এন.এন.এম হাইস্কুলের সম্পাদক রবি অধিকারী স্কুলে পড়ানোর প্রস্তাব করেন এবং প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্র নাথ বোস তাকে যুক্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রকৃত জ্ঞানতাপস মানুষটির সান্নিধ্যে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে নয় তার বাইরে ইংরেজী, ইতিহাস, গণিত সমস্ত বিষয়ে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য স্মরণ করলে আজও বিস্ময় জাগে। নিবন্ধের লেখক নিজে ধর্মবাবুর স্নেহধন্য ছাত্র হওয়ায় চিরকালের ঋণী। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত শ্বেত শুভ্র বেশে প্রতিটি ছাত্রের কাছে তিনি প্রকৃত শিক্ষকের প্রতিমূর্তি। নিরহংকারী সাধাসিধা জীবন যাপনে অভ্যস্ত মাষ্টার মশাই সাইকেলে চেপে হরিপুরের বাড়ি থেকে স্কুলে যাতায়াত করতেন। আজকের যুগে বিরল দৃষ্টান্তের শিক্ষক হিসেবে আজও তুফানগঞ্জ - উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গে দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক তাঁর সামাজিক কাজকর্ম ও ভাষা সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে।

শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষানুরাগী হিসেবে এতদাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার বিস্তারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। আজ তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে যে কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জীবিত আছেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। উনবিংশ শতকের ষাটের দশকে মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ শুধু নয় কুর্নিশ জানাতে হয়। তারিখ জানা যায়নি

কিন্তু সালটা ১৯৬৩। ভান্ডিজালাস গ্রামের সর্বানন্দ সরকার (টেপরা ধনী) নিজের নামে কলেজ স্থাপনের জন্য ৬০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করলে ধর্মনারায়ণ বাবু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধীরেন বসু (এন.এন.এম. হাইস্কুল) দীনেশবাবু ও মণিবাবু উকিল দ্বয়কে নিয়ে তুফানগঞ্জের টাউন হলে সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় মহাবিদ্যালয় নিয়ে সর্বানন্দ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পাশ হবার পর কংগ্রেস নেতা শঙ্কর সেন ঈশোরের আপত্তিতে বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

পরবর্তীতে হুটনি সাহেবকে মহাবিদ্যালয়ের প্রস্তুতি কমিটি প্রস্তাব করায় সাহেব রাজী হয়ে কলেজ স্থাপনে সম্মতি প্রদান করেন। ধীরেন বসু, দীনেশ দে সরকার, মণি চক্রবর্তী, সুবোধ পাল, জয়হিন্দ ক্লাবের সম্পাদক নরেন বর্মা এবং স্বয়ং ধর্মনারায়ণ বর্মা সকলে মিলে কলেজের জন্য জমি সংগ্রহ করেন। জমি সংগ্রহে নরেন বর্মা ও বিনয় দাসের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হুটনি সাহেব প্রস্তুতি কমিটির সংগৃহীত জমিতে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের বিল্ডিং তৈরী করে দেন। পরবর্তী ছাত্র সংগ্রহ ও অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক নিয়োগে ধর্মনারায়ণ বাবু যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে কলিকাতার বিখ্যাত পন্ডিত পবিত্র গুপ্ত মহাশয়কে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগে সমর্থ হন। যার ফলশ্রুতিতে ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মহাবিদ্যালয়টি সরকার পোষিত মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ধর্মনারায়ণ বাবু শুধুমাত্র প্রস্তুতি কমিটির কর্তা ব্যক্তি ছিলেন না পরবর্তীতে এই মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পাশাপাশি তিনি হরিরহাট বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করণেও যথেষ্ট সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি হরিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। ১৯৬২ সালে বারকোদালী গ্রামের রমেশ মন্ডল, রোহিনী সরকার, বাণেশ্বর সরকার, সচীন সরখেল, কার্তিক সরখেল, বসন্ত সরকার, গণেশ কুমার -এর সহযোগিতায় পরিচালন সমিতির সম্পাদক রূপে ধর্মনারায়ণ বর্মা নিজের শৈশবের বিদ্যালয়ের উন্নতি করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এই স্কুলেই কিছুদিনের জন্য দেবেশ্বর বর্মা, ধর্মনারায়ণবাবুর পিতা কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। তরুন সম্প্রদায়ের বিরামহীন প্রচেষ্টায় বারকোদালী প্রাইমারী স্কুল প্রথমে জুনিয়ার হাইস্কুলে ও পরবর্তিতে উচ্চতর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। সেই সময় পরিচালন সমিতির পোষাকি নাম ছিল বিদ্যোৎসাহী সমিতি। নামকরণের থেকেই বোঝা যায় শুধু পরামর্শ নয়, বিদ্যোৎসাহী সমিতির সদস্যদের সংগৃহীত তহবিলেই স্কুল পরিচালনা হত যতদিন না সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে রূপান্তর ঘটে।

তুফানগঞ্জ এন.এন.এম. উচ্চতর বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ছেলেদেরে পড়াশুনার জন্য আর একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। ধর্মনারায়ণ বর্মার বারকোদালী স্কুলের সম্পাদকের অভিজ্ঞতা থাকায় ধীরেন্দ্র নাথ বসু (প্রধান শিক্ষক) নিজের স্কুলে সভা করে নতুন প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহ সম্পাদক রূপে ধর্মনারায়ণ বাবুকে দায়িত্ব দেন স্কুলটি গড়ে তোলার জন্য। জমি সংগ্রহ, তহবিল সংগ্রহ সহ অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যালয় স্থাপন হয় এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। উত্তরবঙ্গের শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস আজও সেভাবে লেখা হয়নি। আমরা ইতিহাসের উল্টোপথের যাত্রীরা জানিনা এই ব্যক্তিদের সত্যিকারের মূল্যায়ণ কবে হবে? শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিদাতাদের পবিত্র দানের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে প্রতিষ্ঠানগুলি। উল্টোদিকে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভূমিদাতাদের স্মৃতিচিহ্নগুলি মুছে ফেলার ঘৃণ্য প্রয়াস শুরু করেছে যা বড় বেদনার।

ধর্মনারায়ণ বাবুর সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বড় দিক ফুঁটে উঠেছে উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক পরিষদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে। ১৯৬৭ সালে এই সংস্থার জন্মলগ্নে সভাপতি ছিলেন তিনি। সহযোগী রূপে পেয়েছিলেন এক ঝাঁক তৎকালীন গ্র্যাজুয়েট ব্যক্তিদের। সুরেন কোঙার, গজেন বর্মন, নরেন বর্মন, প্রভাত সেন ঈশোর প্রভৃতিদের। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে NBCA -এর সম্মেলনের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার কাজ করেছিলেন সংস্থার কর্তা ব্যক্তিরা। NBCA-এর মুখপত্র রূপে 'রায়ডাক' পত্রিকা প্রকাশ উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা। রায়ডাক পত্রিকার স্বাভাবিক ভাবেই সম্পাদক ছিলেন ধর্মনারায়ণ বাবু। এই পত্রিকার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ও আসামের বৃহৎ অংশের সংস্কৃতি চর্চার অভাব পূরণ সেই সময় সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭০ সালে মহারাজ জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর রাজবাড়ি যখন ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হয়ে ধ্বংস হওয়ার পথে, ১৯৭৩ সালে NBCA কুচবিহারে স্থানান্তরিত হয়। নতুন উদ্যমে কুমার প্রোমোদেন্দ্র নারায়ণ সভাপতি হন। ধর্মবাবু সহ সভাপতি হন, পর্বানন্দ দাস হন সম্পাদক, ভোলাবাবু, যোগেনবাবু, প্রভাষ শাস্ত্রী, পুষ্প ভকত, রাকেশ মন্ডল সমিতির সদস্য হন। সমিতির প্রধান উদ্দ্যেশ্য হল মাটির সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ, ইতিহাসের চর্চা এবং শিক্ষা বিস্তার।

পরবর্তীতে কংগ্রেস সরকার এবং বামফ্রন্ট সরকারের রাজবাড়িকে কৃষি কলেজ তৈরীর চেষ্টার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে কলিকাতা, গৌহাটী, দিল্লী, জয়পুর গিয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর উত্তরবঙ্গ সংস্কৃতি পরিষদের আন্দোলনের ফলেই ১৯৮২ সালে রাজবাড়ি অধিগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। যা আজ প্রায় পাঁচশো বছরের কামতাপুরের জীবন্ত ইতিহাসের নিদর্শন রূপে বর্তমান। NBCA -এর কুচবিহার রাজবাড়ি জাতীয়করণের নেপথ্যের মানুষগুলিকে ভুলে গেলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।

ধর্মনারায়ণ বাবু সুশিক্ষক হওয়ার পাশাপাশি এক জন সুসাহিত্যিকও বটে। উত্তরপূর্ব ভারতের ইতিহাসের এক অনালোকিত অধ্যায়কে নিয়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রোমান্সধর্মী 'মহারাজা নরনারায়ণ', 'মহাবীর চিলারায়' ও 'মহারাজা নীলাম্বর' রচনাগুলি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

সাহিত্যিক ধর্মনারায়ণ বাবুর তুলনায় বহুভাষাবিদ রূপে তিনি বেশি খ্যাতি লাভ করেছেন। সুদীর্ঘকালের বাংলা ভাষার পন্ডিতদের উপভাষা তত্ত্বের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন তিনি। এতদাঞ্চলের ভাষায় ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত আলোচনার দ্বারা কামরূপীকে ভাষা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাষার নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে স্থানবাচক -কামতাপুরী নামের সমর্থক। কামতাপুরীকে স্বতন্ত্র ভাষা প্রমাণের জন্য তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'A Step to Kamata Behari Language', 'কামতাবিহারী ভাষার ব্যাকরণ', 'কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা', 'কামতাপুরী ভাষা প্রসঙ্গ', 'আঈভাষা কামাতাপুরী ও ভাষা কমিশন'।

বহু ভাষাবিদ ধর্মনারায়ণ বর্মা প্রাকৃতের পূর্বী শাখা জাতি প্রথম সাহিত্য 'চর্যাপদের' গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ, 'চর্যাপদ' শিরোনামে প্রকাশ করেন। চর্যাপদের ভাষার রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে চর্যার ভাষাকে 'কামরূপী মৈথিলী ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়া গান বলে উল্লেখ করেছেন।

'কামরূপ-কামতা কুচবেহারের ইতিহাস' শিরোনামে লেখক ধনেশ্বর মান্তা মহাশয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। চির তরুণ এই সারস্বত সাধক 'পরমার্থ তত্ত্ব' ও 'পরমার্থ পথে জিজ্ঞাসা' নামে দুটি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শেষ জীবনে এসে নিজের জীবন কাহিনী নিয়ে 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থের প্রথম ভাগ লিখেছেন তিনি। তুফানগঞ্জের ঐতিহাসিক দলিল রূপে স্মৃতিকথার গুরুত্ব অপরিসীম। নবতিপর তরুণ ধর্মনারায়ণ বর্মা উত্তর পূর্ব ভারতের কৃতী সন্তান। ভারত সরকার ২০২০ সালে তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করেছেন। তিনি প্রকৃতই পদ্মশ্রী। ২০১৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার Global Peace University তাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ২০১১ সালে 'জাগরণী গ্রুপ অফ পাবলিকেশন' সাহিত্য, গবেষণা ও চর্চার জন্য তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি প্রকৃতই তুফানগঞ্জ - কুচবিহার তথা ভারতের 'পদ্মশ্রী'।

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
পোঃ-রামপুর, থানা-বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

ভারপ্রাপ্ত প্রধান
রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

নাটাবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- নাটাবাড়ী, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান
নাটাবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

উন্নয়নই হোক আমাদের অঙ্গীকার

শালবাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- শালবাড়ী, থানা-বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

ভারপ্রাপ্ত প্রধান
শালবাড়ী -২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের
সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

সম্প্রীতি হোক আমাদের অঙ্গীকার

মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
পোঃ-মহিষকুচি, থানা-বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

সুমন বর্মন
প্রধান,
মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

ভানুকুমারী -১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- ভানুকুমারী, থানা-বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

সোমা বাগচী

প্রধান,

ভানুকুমারী ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের নিম্নলিখিত বিভিন্ন উন্নয়নে আমরা দায়বদ্ধ ঃ-

১) জি.পি.-র মানব সম্পদ
২) পরিকাঠামো
৩) হেলথ
৪) সর্বশিক্ষা
৫) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজে কল্যাণ
৬) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ধলপল গ্রাম-১ পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ-ধলপল, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

নূর ইসলাম মিঞা
উপ প্রধান,
ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতি কবিতা দাস
প্রধান,
ধলপল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- চিলাখানা, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- রামপুর, থানা- বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

মদন চন্দ্র দাস
উপ-প্রধান,
রামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

মালতী বর্মন
প্রধান,
রামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

করবো কাজে,

গড়বো মোরা সোনার গ্রাম

ফলিমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- ফলিমারী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
ফলিমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- ধলপল, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

করবো কাজে,

গড়বো মোরা সোনার গ্রাম

বারকোদালী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
বারকোদালী -১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

বারকোদালী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ-বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
বারকোদালী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

করবো কাজ,

গড়বো মোরা সোনার গ্রাম

চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- চিলাখানা, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

শ্রী মতিলাল দাস
প্রধান,
চিলাখানা -১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

ভানুকুমারী -২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- ভানুকুমারী, থানা-বক্সিরহাট, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
ভানুকুমারী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

করবো কাজে,

গড়বো মোরা সোনার গ্রাম

অন্দরাণফুলবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
অন্দরাণফুলবাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

অন্দরাণফুলবাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
অন্দরাণফুলবাড়ী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

করবো কাজে,

গড়বো মোরা সোনার গ্রাম

বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ-বালাভূত, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সাফল্য কামনায় ঃ–

স্বচ্ছতার সাথে জনগণের সেবা দিতে

আমরা দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ

নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত

তুফানগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি

পোঃ- নাককাটিগাছ, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা-কোচবিহার

প্রধান,
নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে বয়েজ ক্যাডেটরা

আন্তঃ কলেজীয় কাবাডি খেলায় বিজয়ী শারীরবিদ্যা বিভাগের ছাত্রীরা

এন.সি.সি. -র ক্লাসে ক্যাডেটরা

সামাজিক কর্মকান্ডে এন.সি.সি. ক্যাডেটরা

আন্তঃ কলেজ ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শারীরবিদ্যা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা

বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতে মহাবিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প

এন.এস.এস. ডে পালনে ছাত্র-ছাত্রীরা

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভিক পর্বের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে রাজবংশী লোকনৃত্য

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে রাভা নৃত্য

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভিক পর্বের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে রাভা নৃত্য

আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে রাভা নৃত্য

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভিক পর্বের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভিক পর্বের অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

चरैवेति